দাম : ৭০ টাকা

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা - ১৪২৬
২৩ সেপ্টেম্বর - ২০১৯

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ৫ সংখ্যা,
৫ আশ্বিন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২৩ সেপ্টেম্বর - ২০১৯
যুগাব্দ - ৫১২১
Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত
সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়
রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)
সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
দাম : ৭০ টাকা

Postal Registration No.-
KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

দেবী প্রসঙ্গ

বিদ্বদ্‌নয়নে দুর্গাতত্ত্বান্বেষণ
স্বামী ত্যাগিবরানন্দ — ১৯

দুর্গাভাবনা : বেদ থেকে বর্তমান
জয়ন্ত কুশারী — ২৩

উপন্যাস

মহিষাসুর নির্ণাশী

প্রবাল চক্রবর্তী ৭০

অভ্রকণা, অশ্রুকণাগুলি

রন্তিদেব সেনগুপ্ত ১৪৪

চিহ্নায়ন

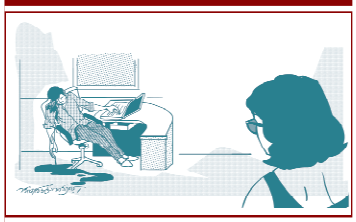

শেখর সেনগুপ্ত ২০২

লিপা

জিষ্ণু বসু ২৬০

গল্প

ধুলো

সন্দীপ চক্রবর্তী ২২৩

আমার বন্ধু পার্থ

রমানাথ রায় ৪৭

সমাপ্তি

এষা দে ৫৫

সন্ধ্যাবেলার কাব্য

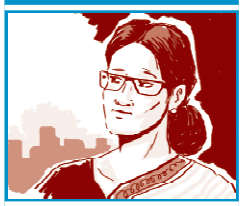

মালিনী চট্টোপাধ্যায় ১৯১

অমরত্ব

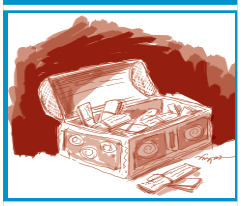

সিদ্ধার্থ সিংহ ২৮৯

তৃতীয় পানিপথ

গোপাল চক্রবর্তী ৩০৩

প্রবন্ধ

সর্বসমাবেশক হিন্দুত্ব

শ্রীরঙ্গাহরি ২৭

কালজয়ী বিদ্যাসাগর

অভিজিৎ দাশগুপ্ত ৩১

হরিহরের পথ ও পাঁচালী

অচিন্ত্য বিশ্বাস ৩৯

বনবাসী সংস্কৃতিতে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ

ড. সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৭

উনিশ শতকের কলকাতায় মগ মন্দির ও তার দেউলিয়া পুরোহিত

অরিন্দম মুখোপাধ্যায় ১৯৫

হিন্দু জাতীয়তাবাদের আখ্যান

জয়ন্ত ঘোষাল ২১৯

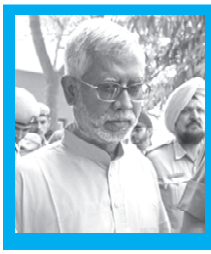

এক যোদ্ধা সন্ন্যাসী

বিজয় আঢ্য ২৩৭

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এক জাতি এক দল এক নেতা

সুজিত রায় ২৪৯

সনাতন হিন্দুধর্ম ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ২৫৫

রসরাজ রাজশেখর

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭৭

চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারতের অবদান

কল্যাণ চৌবে ২৮৫

ভ্রমণ কাহিনি

বোহেমিয়া-বাভারিয়ার ভূখণ্ডে

কুণাল চট্টোপাধ্যায় ১৩১

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রেখাঙ্কন ও শিরোমিতিবিদ্যার প্রয়োগ ও প্রভাব

অর্ণব নাগ ২৯৫

জাতীয়তাবাদী বঙ্কিমচন্দ্র ও দুই জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক

সুদীপ বসু ২৯৯

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana (NR) ®
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

A True Nationalist by Heart and Follower of Shyamaprasad Mukherjee

Late Shri Harswarup Gupta

Founder & Ex Chairman : Keshav Madhav Saraswati Vidhya Mandir, Kakor,
Dist. - Bulandshahr, P.O. - Gautam Budh Nagar, UP
Ex Chairman of AMD INDUSTRIES LTD.
18th Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi - 110 005

Present Chairman : Shri Ashok Gupta
S/o. Late Shri Harswarup Gupta
Res. : 6, Central Drive, DLF Chattarpur Farms
Chattarpur, New Delhi - 110 074
Ph. +91 11 46830202, Email : agupta@amdindustries.com

বিদ্বদ্ নয়নে দুর্গাতত্ত্বান্বেষণ

স্বামী ত্যাগিবরানন্দ

স্বকল্পিত বিধানদাতা স্বার্থান্বেষী পুরোহিতকুল, মৌলতন্ত্র ও পোপতন্ত্রের অজ্ঞানাঞ্জন লিপ্ত নয়নে দুর্গাতিত্ত্বান্বেষণ নয়, এই অন্বেষণ বিদ্বদ্ নয়নে নব যুগের অভিধান চয়ন করে। পৌরাণিক যুগে পৌরোহিত্যের অস্পৃশ্যতারূপ অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতেই একদিন লক্ষ লক্ষ দরিদ্র অসহায় হিন্দু জনগণ মুসলমানদের দরগায় যেতে বাধ্য হয়েছে। আর সেই সুযোগেই তারা ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয়। এই নির্মম পুরোহিত তন্ত্রের

প্রভাবেই ভারতীয় সভ্যতা ও সমাজ দুশো বছর পিছনে পড়ে গিয়েছে। বিবেকানন্দই একমাত্র পুরোহিততন্ত্র ও মৌলতন্ত্রের নিষ্ঠুর বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। সুতরাং, দুর্গাপূজার তত্ত্বান্বেষণ পুরোহিত নয়নে নয়, এ অন্বেষণ যুক্তিবাদী বিদ্বদ্ নয়নে।

বিবেকানন্দের কথায়, 'কারো মতে মত দিয়ে বিশ লক্ষ দেবতার বিশ্বাস করা অপেক্ষা যুক্তির অনুসরণ করে নাস্তিক হওয়া ভালো।' শতপথ ব্রাহ্মণেও বলা হয়েছে— 'যঃ অন্যং দেবতাম্ উপাসত্যেন স বেদ যথা পশুরেব স দেবানাম্'— অর্থাৎ কল্পিত দেবতার উপাসনাকে পশুতুল্য বলা হয়েছে। কারণ, পরমাত্মা ও তাঁর মূর্তপ্রকাশ সর্বজীবকে ভুলে প্রতিমা পূজা নিরর্থক। শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৯।২১-২৫) : অরূপকে রূপের কল্পনার খাঁচায় বন্দি করে তাঁর অনির্বচনীয়তাকে খণ্ডন করার জন্য মহর্ষি বেদব্যাসও পুরাণ লিখে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। সাধক রামপ্রসাদ গেয়েছিলেন— 'মায়ের মূর্তি গড়তে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে। মা বেটি কী মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি দিয়ে।' সুতরাং, এই সকল উক্তি এটাই প্রমাণ করে যে, প্রতিমা পূজা মূলত তত্ত্বেরই পূজা, সমাজ সচেতনতারই পূজা। সেই তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত না হলে প্রতিমা পূজা নিরর্থক। সুতরাং, পূজার তত্ত্ব না জেনে কেবল পুরোহিতের বিধান অনুসারে যে পূজা করা হয়, তা প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞানপূর্বক পূজা। তাই পূজাতত্ত্বটির যথার্থ অন্বেষণ সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

মহাবিশ্বে বিস্ফোরণের ফলে যে প্রচণ্ড পরিমাণে শব্দ ও বিপুল পরিমাণে শক্তি বিচ্ছুরিত হয়েছিল, ঋগ্বেদে সেই শক্তিকেই 'বিশ্বেদেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাতমদিতিজনিত্বম্', অর্থাৎ 'অদিতি' বলা হয়েছে। সেই অদিতিই চৈতন্যদায়িনী দুর্গারূপা মহেশ্বরী আজ শারোদোৎসবে দেবীমাতৃকারূপে মৃন্ময়ী প্রতিমায়, বিল্ববৃক্ষে ও নবপত্রিকায় (উদ্ভিদ জগতের বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত মোট নয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য ও ভেষজ গুণসম্পন্ন উদ্ভিদের সমাহার) আবিভূতা ও আরাধিতা হচ্ছেন। সেই শক্তিই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের আদি 'অক্ষর-ব্রহ্ম' বা 'শব্দ-ব্রহ্ম' হিসাবে ওঁ-কার শুঁঙ্গরূপী গণেশের মধ্য দিয়ে আরাধিতা হচ্ছেন। বিস্ফোরণের পর যে প্রচণ্ড শব্দের সৃষ্টি হয়েছিল, তারই চিহ্ন হিসাবে শিবের হাতের ডমরু যুক্তিবাদী নয়নে প্রতিভাত হচ্ছে বিরাটের প্রতীকরূপে। শয়নার্থক 'শী' ধাতু থেকেই 'শিব' শব্দটির উৎপত্তি। যেখানে সকলে শয়ন করেন— অর্থাৎ সকলের যিনি আধার তিনিই শিব। আবার যিনি অশুভের নাশ করে মঙ্গল বিধান করেন, যিনি মঙ্গলময়, সুখ ও আনন্দ স্বরূপ তিনিই শিব। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শঙ্কা, জুগুপ্সা, কুল, শীল এবং জাতি— এই আটটিকে অষ্টপাশ থেকে যিনি মুক্ত তিনিই শিব। যে সমষ্টি অধিষ্ঠানচৈতন্যে অষ্টশক্তি প্রকাশিত হয় তিনিই শিব। আবার যে আধারে প্রলয় হয় সেই আধারই মহেশ্বর। সেই মহেশ্বরই সর্বগুণাধার। তাই, সাবজেক্টরূপী (আধার) শিব আঁকা থাকে অবজেক্টরূপী (আধেয়) দুর্গাপ্রতিমার পিছনে। তাই, শিব অজ্ঞানরূপী নয়নের অগোচরে অর্থাৎ প্রতিমার পশ্চাতে।

দুর্গাপূজায় লিঙ্গপূজা আবশ্যক। 'লিঙ্গ' অর্থে যে পরম সত্তার মধ্যে জগৎ লীন হয় এবং যাঁর থেকে জগতের আবার উৎপত্তি হয়, সেই পরম কারণকেই বলা হয় লিঙ্গ। শিবের প্রতীক চিহ্ন বলে তাকে শিবলিঙ্গ। শাস্ত্রকাররা বলেছেন, লিঙ্গপূজা না করে অন্য দেবতার পূজা করলে সেই পূজা বিফল হবে এবং যিনি পূজা করবেন তাঁর নরকে গতি হবে। লিঙ্গার্চন তন্ত্রে আছে, 'লিঙ্গপূজাং বিনা দেবি! অন্য পূজাং করোতি যঃ। বিফলা তস্য পূজাস্যাদন্তে নরকম্ আপ্নুয়াৎ।' লিঙ্গ কোনো অঙ্গবিশেষ নয়, তা হল সাক্ষাৎ মহেশ্বরের জ্যোতির্ময় রূপের প্রকাশ এবং গৌরীপট্ট হলো জগন্ময়ী মা পার্বতীর চিন্ময়ী রূপ। লিঙ্গপূজার আগে আচমন করা বিধি। কারণ, মোক্ষের পথে যেতে গেলে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনার্থে সর্বাগ্রে আচমনমন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ করার বিধি। আমরা কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে বিষয়ভোগ করতে গিয়ে ওই সকল ইন্দ্রিয় অশুদ্ধি করে ফেলি। তাই সর্বাগ্রে আচমনের মধ্য দিয়ে শুদ্ধি করা প্রয়োজন। চক্ষু যেমন রূপজ মোহে আসক্ত, কর্ণ তেমনি শব্দজ মোহ, জিহ্বা লোভ, নাসিকা সুগন্ধে, মন নানা বিষয় মোহে আকৃষ্ট হয়ে আত্মার শুদ্ধস্বরূপতা ভুলে গিয়ে অশুদ্ধপ্রাপ্ত হয়। তাই, এই সংস্কাররূপ উচ্ছিষ্টগুলি প্রথমেই (আচমন তারই প্রতীকী) ধুতে হয়। আচমনের পর ন্যাস করা হয়।

সেই 'ন্যাস' মানে ত্যাগ বা স্থাপন। আমাদের প্রতিটি অঙ্গে যে 'আমি ও আমার' বোধ আছে, সেটি ত্যাগ করলেই ভগবৎ সমীপে গমন করা সম্ভব। ন্যাসের সময়ে 'আং', 'ঈং' প্রভৃতি মাতৃকা মন্ত্র উচ্চারণ করার কারণ হলো যে— সাধক ক্রমে মাতৃকাময় হয়ে উঠবেন, অর্থাৎ সকল জড়ত্ব (তামস, মহিষের প্রতীক) থেকে মুক্ত হয়ে কক্রে রজ (সিংহ) এবং অবশেষে শুদ্ধসত্ত্বগুণা সম্পন্না দণ্ডায়মান মা। জীবের চেতনভাবটি এইরূপ চিন্তার ফলে উদ্ভাসিত হয়। তাই পূজক ব্যাপকন্যাস, মাতৃকান্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নিজেকে শুদ্ধ হওয়ার ভাবনায় ভাবিত হওয়া চেষ্টা করেন। কারণ, শুদ্ধমনেরই ঈশ্বরের দর্শন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন— 'ঈশ্বর শুদ্ধ মনের গোচার।' এটিই ন্যাসতত্ত্বের মূল তাৎপর্য।

মহালয়া থেকেই দুর্গাপূজা অর্থাৎ দেবীপক্ষের সূচনা হয়। মহালয়া তত্ত্বটি হলো মহান আলয় অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। অথবা, মহতের পরমস্থান যেখানে। 'মহা' 'লয়' অন্য অর্থে জীবগণ পরমলীন হয় যেখানে। আবার মহতাদির লয় হয় যেখানে অর্থাৎ পরমাত্মায় বা পরব্রহ্মে। এই মহালয়ে তর্পণাদি অনুষ্ঠানটিও তাৎপর্যপূর্ণ। তর্পণ হলো— দেবতা, ঋষি ও পূর্বপুরুষের তৃপ্তিবিধানের উদ্দেশে জলের অঞ্জলি নিবেদন। এই অঞ্জলি

প্রদান্যের মধ্য দিয়ে পরিবার, দেশ, জাতি ও সমাজে এক সংহতি স্থাপিত হয়। জলশুদ্ধি বা তীর্থ আবাহন সময়ে অঞ্জলি প্রদানকালে বলা হয় ঃ 'ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ। তীর্থ্যানি এতানি পুণ্যানি তর্পণ-কালে ভবন্ত্বিহ।' 'ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিন্ধু-কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।' হে যুক্তিবাদী পাঠক! সনাতন হিন্দুধর্মে তর্পণের মধ্য দিয়ে কীভাবে সংহতিবোধের বার্তা যাচ্ছে তা ভাবলে অবাক হতে হয় না কী? সুতরাং সনাতন হিন্দু ধর্মই সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের কাছে আদর্শ ও পথপ্রদর্শক।

এরপর দেবীর বোধনপর্ব। বোধন মানে বোধ শক্তির উন্মেষ। এই বোধ সম্পর্কেই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন— 'তোমাদের চৈতন্য হোক'। চরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায়স্বরূপ আত্মশক্তির (চৈতন্যর) উদ্বোধন হওয়াই বোধন। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বিল্ববৃক্ষকে দেখানো হয়েছে সূর্যের প্রতীক হিসাবে— 'বিল্বং জ্যোতিরিতি আচক্ষতে'। তাই সূর্যকে সর্বশক্তির আধার মনে করে তাঁর নিকট মহাশক্তির আবাহন করা হয়।

বোধনের পরই দেবীর মহাস্নান। এই মহাস্নানের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে সমাজের পূর্ণাঙ্গ ছবি। যেখানে দেবীকে পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চকাষায়, দুগ্ধ-দধি, বিভিন্ন নদ-নদীর জল, পতিতালয়ের গৃহ মৃত্তিকা দিয়ে দেবীর মহাস্নান করানো হয়। এর মধ্যে দিয়ে সমাজের কৃষিসম্পদ, খনিজসম্পদ, বনজসম্পদ, গোরক্ষা, নদী সংযোগ প্রভৃতি সার্বিক সমাজ কল্যাণ চিন্তা ফুটে ওঠে। দেবী দুর্গার আর এক নাম শাকম্ভরী। সর্বজীবের প্রাণরক্ষার উপযোগী শাকের দ্বারা পৃথিবীকে পালন করেন বলেই দেবী শাকম্ভরী নামে পরিচিতা। কারণ দেবী পূজার সঙ্গে সমাজ-কল্যাণ চিন্তাও অনুসৃত থাকে। সেইজন্য নবপত্রিকার পূজা মূলত একবীজ ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ, দুর্বল ও সবল কাণ্ডযুক্ত একাধিক ঔষধি গুণসম্পন্ন উদ্ভিদের সমাহারে সম্পন্ন বনজ সম্পদের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও মানব স্বীকৃতির উজ্জলতম দৃষ্টান্ত। তাই, নবপত্রিকার আরাধনা।

এরপর মঙ্গলঘট স্থাপন করা হয়। এই একটি গভীর তত্ত্ব। আমরা জানি যে, মানুষের যেমন প্রথম আবির্ভাব ঘটে মাতৃগর্ভে অর্থাৎ প্লাসেন্টায়। সেইরূপ দেবতাদেরও প্রথম আবাহন করা হয় মঙ্গলঘটে। ঘট মঙ্গল হওয়া কারণ, এই (দেহরূপ) ঘট দিয়েই মানুষ আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে। তাই, সেই ঘটটি স্থাপন করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। সুতরাং, ঘট বা কলস দেবশক্তিরই প্রতীক। শিশু মাতৃভূমি স্পর্শ করার আগে যেমন সেই স্থানটিকে ডেটল, ফিনাইল প্রভৃতি ছিটিয়ে পরিশুদ্ধ রাখা হয়, সেইরূপ ঘট স্থাপনের পূর্বে বেদিটিকেও শোধন করা হয়। ঘটটি জলপূর্ণ করতে হয়। জলই জীবন বা প্রাণ। জলে তাই প্রাণশক্তির প্রতিষ্ঠা। মৃত্তিকার উপর পঞ্চশস্যাদি দিয়ে তদুপরি জলঘটটি স্থাপনা করা হয়। ঘটে পঞ্চরত্ন বা নবরত্ন অবশ্য দেয়, ঘটের মুখে পঞ্চপল্লব। তাই, তত্ত্বগুলোকে সূক্ষ্মদেহকে বিশেষভাবে ধরার জন্যই তদনুকল্পরূপে ঘটস্থাপন শাস্ত্রে বিহিত হয়েছে। এই পরিদৃশ্যমান স্থূলদেহ সূক্ষ্মদেহেরই ঘনীভূত বিকাশ বা অভিব্যক্তি। স্থূলশরীর সূক্ষ্মে লীন হয়, সূক্ষ্ম শরীর আবার কারণশরীরে লীন হয়। তখন কারণাতীত ক্ষেত্রের দিকে অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মার দিকে নিপতিত হয়। এইভাবেই জীব আত্মস্বরূপের সন্ধান পায়। ঘটের গায়ে সিন্দুরমূর্তি সূক্ষ্ম দেহেরই প্রতিরূপ। দেবপূজায় সূক্ষ্মদেহের অনুভবই বিশেষ প্রয়োজনীয়। হৃদয় থেকেই দেবশক্তির আবির্ভাব হয়। যতক্ষণ দেবতার উদ্দেশে অর্পিত পত্র পুষ্প প্রভৃতি উপচার স্বকীয় হৃদয়স্পর্শের অনুভূতিকে প্রকাশ করতে না পারে, ততক্ষণ বুঝতে হবে, যথার্থরূপে ঘটস্থাপন হয়নি। আত্মশ্রদ্ধা সহ পরমদেবতাকে স্থূলে এনে প্রাণ ও জ্ঞানশক্তির সাহায্যে মনকে সূক্ষ্মতত্ত্বে নিবদ্ধ রেখে ক্রমে স্থূল থেকে সূক্ষ্ম শরীরে, সূক্ষ্ম থেকে কারণশরীরে এবং কারণ থেকে কারণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াই মঙ্গলঘট স্থাপনের সার্থকতা। বেদে আছে — 'যজ্ঞো বৈ মহিমা'— 'মহিমা' বা মঙ্গলঘট আসলে সূর্যেরই প্রতীক। বৈদিক যজ্ঞে যে তিনটি ঘটের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহলো একই সূর্যের তিনটি বিবর্তিত অবস্থামাত্র। সূর্যের তিন বিবর্তিত রূপ হলো প্রাতঃসূর্য, যার দেবী সরস্বতী, মধ্যাহ্ন সূর্য যার দেবী দুর্গা এবং সায়ং সূর্য যার দেবী লক্ষ্মী। অর্থাৎ প্রত্যেক জীবাত্মাকেই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় বা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বা জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। যা পরবর্তীকালে ত্রিরত্ন বা ত্রিশক্তির প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। তারই প্রতিরূপ ঘটত্রয়। এই ত্রিশক্তিই মাতৃকারূপে পূজিতা হন মঙ্গলঘটে। যে কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে তাই আমরা এই তিনটি ঘটের সহাবস্থান দেখতে পাই। প্রবেশদ্বারের দু'পাশে দুটো এবং মূল অনুষ্ঠানকেন্দ্রে পূজকের সামনে একটা। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের প্রতীক ঘট বা পুণ্যকলস সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী মাতৃকারূপে পূজিতা হন। ঘটের উপরে ডাব বা নারিকেল দেওয়ার কারণ আমাদের বুদ্ধি বা জ্ঞানশক্তির স্থান যেহেতু মাথা। যেহেতু, মাতার প্রতীক হিসাবে 'ডাব' ঘটের উপরে থাকাই স্বাভাবিক। ঘটের গায়ে স্বস্তিক আঁকা থাকার কারণ স্বস্তিক চিহ্ন মূলত সূর্য বা বিষ্ণুর চক্রের প্রতীক হিসাবেই পূজিত হয়। নিয়ত পরিবর্তনশীল জগতের কেন্দ্রস্থলে ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং অবস্থান করে সংসারী জীবকুলকে সকল অশুভ শক্তির হাত থেকে নিয়ত রক্ষা করেন বলেই স্বস্তিক মঙ্গলের প্রতীক।

ঘট স্থাপন ও নবপত্রিকা স্নানের পরই শুরু হয় দর্পণ প্রতিবিম্বে দেবীর মহাস্নানপর্ব। এই মহাস্নান-তত্ত্বটি বিদ্বদ্ নয়নে বিশ্বরূপ দর্শনের সমতুল্য। সামাজিক বা রাজনৈতিক দৃষ্টিতেও এই মহাস্নানের মধ্য দিয়ে প্রস্ফুটিত হয় সমাজের এক পূর্ণাঙ্গ সংহতির

ছবি। এই মহাস্নানে দেবীকে পঞ্চশস্য— (ধান, গম, যব, ভুট্টা, ডাল), পঞ্চরত্ন (সোনা, রুপা, তামা, ব্রোঞ্জ, হিরা), পঞ্চকাষায়— (জাম, বকুল, কুল, বেড়ালা ও শিমুল), পঞ্চগব্য— (দুধ, দই, ঘি, গোমূত্র, গোময়), শিশির, বৃষ্টির জল থেকে শুরু করে সপ্তনদী ও সপ্ত সাগরের জল, নদী মৃত্তিকা, পতিতালয়ের গৃহ মৃত্তিকা প্রভৃতি নানা উপাচার দিয়ে দেবীর মহাস্নান করানো হয়। এইসকল ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমাজের কৃষি-সম্পদ, খনিজ-সম্পদ, বনজ-সম্পদ, জল-সম্পদ, গোরক্ষা প্রভৃতি সার্বিক সমাজ কল্যাণ চিন্তা ফুটে ওঠে। নৈতিকতা স্থাপনে সর্বভূতজননী ওই দেবীরই অধিষ্ঠান স্বরূপ পতিতোদ্ধারের ভাবটিও ফুটে ওঠে। চাষাভুসা, মুচি-মেথর থেকে শুরু করে ব্রাহ্মণ, মালী, কুম্ভকার, তন্তুবায়, নরসুন্দর, ঋষি, দাস সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ বিশ্ব সংহতি ও বিশ্বের কাছে এক অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়ের সমন্বয়-বার্তা প্রেরণ করে। এইরূপ এক সঙ্ঘবদ্ধ জাতিগঠন ও রাষ্ট্রভাবনা আমাদের মনে সংহতির মানচিত্র অঙ্কিত করে।

বিদ্বদ্ মননে গণপতি তত্ত্বটিও অপূর্ব। তাঁর পূজা প্রথম হওয়ার কারণ বিশ্বসৃষ্টির প্রথমেই যে শব্দটি উদ্‌গিরিত হয়েছিল সেটি হলো ওঁ-কার। গণেশের ওঁ-কার সদৃশ্য শুন্ড সেটিরই নির্দেশ দেওয়ার তাঁর পূজা সর্বাগ্রে করা হয়। দ্বিতীয় কারণ, তিনি জনগণের অধিপতি, তাই তিনি 'গণপতি'। আবার তিনি 'গণানাম্ ঈশ্বরঃ'— 'গণেশ' অর্থাৎ জনগণের ঈশ্বর বা প্রভু। তৃতীয়ত, তিনি ব্যাসদেবের (ব্যাস-'জ্ঞানী' অর্থে) দক্ষ স্টেনোগ্রাফার। তাই তিনি লিপিকার গণেশ। এছাড়া যিনি ক্ষুদ্রের সঙ্গে বৃহতের, অভিজাতের সঙ্গে অবনতের মিলন ঘটিয়ে স্বকীয় গ্রীবাদেশে যুক্ত করেছেন, ধনী, অভিজাত, প্রজ্ঞাবান, পণ্ডিত, শক্তিমান নাগরিকদের প্রতীক হিসেবে বৃহৎ শক্তিশালী গাম্ভীর্যপূর্ণ হাতির মাথাখানি, তিনিই আবার দরিদ্র, অবহেলিত, মূর্খ, দুর্বল, পরিশ্রমী, উপেক্ষিত ব্যক্তিদের প্রতীক হিসেবে বাহন করেছেন অতি ক্ষুদ্র, ধৈর্যশীল, মূষিকপ্রবরকে অর্থাৎ যিনি ছোট বা বড়ো কাউকেই উপেক্ষা না করে ঐক্য ও সমন্বয়ের এক বিশ্বজনীন মূর্তি গড়ে তুলতে চান তাঁর আরাধনাই তো সর্বাগ্রে হওয়াই যুক্তিযুক্ত। এলিস গেটির মতে, গণেশের বড়ো দাঁত লাঙ্গলের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় তাঁকে কৃষির দেবতাও বলা হয়। বিষ্ণুর মতো গণেশেরও হাতে শঙ্খ-চক্র গদা ও পদ্ম। শব্দের প্রতীক শঙ্খ বা ডমরু, কালের (সময়ের) প্রতীক হিসাবে চক্র, সকল স্থূলবস্তুর প্রতীক হিসেবে গদা, সকল কার্যের উৎপত্তিস্থলের আধারের প্রতীক হিসেবে পদ্ম (এই পদ্মই সনাতন হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রতীক)। সুতরাং, সৃষ্টির আদিরূপ গণেশ। তার পূজাই সর্বাগ্রে হওয়া অভিপ্রেত। ভগবান বিষ্ণু হলেন সকল জীবের পালন ও রক্ষাকর্তা। গণেশও তাই। ঐতিহাসিক এলিস গেটির মতে, গণেশের গ্রীবা দেশে হাতির মাথা ও পাদদেশে বাহন মুষিক পশু-সংস্কৃতিকে স্মরণ করায়। আবার লাঙ্গলের মতো তাঁর একদন্ত কৃষির দেবতা বলেই অনুমিত হয়। তাঁর বাহনটি হলো অতি ক্ষুদ্র ও উপেক্ষিত প্রাণী মূষিক। মূষিক খুবই পরিশ্রমী। তাঁর দুটি তীক্ষ্ণ দাঁত বিবেক ও বৈরাগ্য। এই দুটি থাকলেই তাকে মান্-হুঁস বলা যায়। অতএব, গণেশ তত্ত্বটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

আরও দুটি মূলতত্ত্ব হলো— কুমারীপূজা ও সন্ধিপূজা। সমাজে শুদ্ধ মাতৃভাব প্রতিষ্ঠার্থেই দুর্গাপূজায় কুমারীকে 'জ্যান্ত দুর্গারূপে' প্রতিমার পাশে রেখে আরাধনার ব্যবস্থা। কারণ, শুদ্ধ, সাত্ত্বিকভাবে অন্তর পূর্ণ হলে তবেই বিশ্ব কলুষমুক্ত হতে পারে। সন্ধিপূজা হলো কুমারী পূজার সমাপন্তে অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণের ৪৮ মিনিটের সন্ধিপূজার অনুষ্ঠানও এক মহাযজ্ঞ স্বরূপ। মহাশক্তি মহামায়া এখানে রণচণ্ডিকামূর্তিতে দণ্ডায়মান। তাই, তাঁর শ্রীচরণে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করাই এই পূজার মূল উদ্দেশ্য। আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষণই সন্ধিপূজার সমতুল্য। কারণ, সব সন্ধিক্ষণেই বিরাজ করে মৃত্যুর অভিসার! উপায় হলো মহৎ ক্ষণটিকে ধরা।

পূজার অন্তিম দিনে ভক্তগণ পরমানন্দে সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন। সিঁদুর (লাল রঙ) যা অনুরাগের প্রতীক। পরমাত্মার প্রতি অনুরাগ বশতই এক জীবাত্মা অপর জীবাত্মার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই আকর্ষণই অনুরাগরূপ সিঁদুর। জীবত্ব নাশ ও শিবত্বপ্রাপ্তিই দুর্গাতত্ত্বের মূল তাৎপর্য।

(লেখক সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, কৈলাসহর, ত্রিপুরা)

TRADE CENTRE (INDIA)

37, Lenin Sarani
Kolkata - 700 013
e-mail : t.c.india@vsnl.net
Fax : 91-33-2249, 8706
Ph. : 2249-8722

দুর্গা ভাবনা : বেদ থেকে বর্তমান

অধ্যাপক জয়ন্ত কুশারী

নিজের নাম প্রসঙ্গে স্বয়ং দেবী দুর্গা (শ্রীশ্রী চণ্ডীতে) বলেছেন— সেই সময় (শাকম্ভরী রূপে) আমি যখন 'দুর্গম' নামের মহাসুর বধ করব তখনই আমি 'দুর্গাদেবী' নামে খ্যাত হব।

তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্।
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।। ১১।৫০

দ্ + উ + র্ + গ্ + আ এই বর্ণগুলিকে পাওয়া যায় দুর্গা শব্দটি বিশ্লেষণ করলে। তাঁর স্বরূপের ব্যাখ্যা রয়েছে প্রতিটি বর্ণের মধ্যেই।

অর্থাৎ দ-কার দৈত্য বিনাশের, উ-কার বিঘ্ননাশের, র-কার সর্বরোগের বিনাশের, গ-কার পাপনাশের এবং আ-কার শোক দুঃখাদি জগৎ ও সর্বশত্রু বিনাশের সূচনা করে।

দৈত্যনাশার্থ বচনো দকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ
উকারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদসম্মতঃ।
রেফো রোগঘ্ন বচনোগশ্চপাপঘ্নবাচকঃ
ভবশত্রুঘ্নবচনশ্চকারঃ পরিকীর্ত্তিত।।

আবার ব্যাকরণগত ব্যাখ্যায় তিনি—

দুঃখেন গম্যতে যা, যা দুর্ উপসার্গৎ গম্ ধাতোরচ্ স্ত্রিয়াম্ আপ্ বা ঈপ্ ইতি দুর্গা বা দুর্গি শব্দ ব্যুৎপত্তিঃ।

যাঁকে দুঃখের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া বা জানা যায়, তিনিই দুর্গা। এই হলো দুর্গা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। এখন দুর্গা শব্দ সচরাচর শোনা যায়, কিন্তু দুর্গি শব্দের প্রয়োগ কোথায়? কিন্তু না, তাও পাওয়া যায় তৈত্তিরীয় আরণ্যকের যাজ্ঞিকা উপনিষদে দুর্গার গায়ত্রীতে 'কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারীং ধীমহী, তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ।' বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য্যের মতে দুর্গা ও দুর্গি অভেদ।

এখন প্রশ্ন হলো এই দুর্গা কে?

আদ্যা প্রকৃতির নামই দুর্গা। শক্তি নিরাকার, কর্মদ্বারা শক্তি অভিব্যক্ত হয়। আমাদের জ্ঞানে বিশ্বব্রাহ্মাণ্ড সেই কর্ম। অতএব দুর্গা বিশ্বরূপা। জড় ও শক্তি একই পদার্থ, এটা আধুনিক ভূতবিদ্যাবেত্তা পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করেছেন। কল্পনার দ্বারা অগ্নি ও এর দাহিকা শক্তি পৃথক ভাবতে পারি। কিন্তু বস্তুত পৃথক করতে পারি না।

আধ্যাত্মিক অর্থে দুর্গা বিশ্বরূপা মহাশক্তি। আধিভৌতিক অর্থে পঞ্চভূতের মধ্যে দুর্গা অগ্নিরূপা। আধিদৈবিক অর্থে দুর্গা রুদ্রদেবের শক্তি। রুদ্রদেবের শক্তি; রুদ্রযজ্ঞীয়াগ্নি। যে অগ্নি নানারূপে খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০০ অব্দ হতে পূজিত হয়ে আসছে।

যে প্রত্যহ প্রভাতে 'দুর্গা দুর্গা' এই অক্ষরদ্বয় বিশিষ্ট দুর্গানাম স্মরণ করে, সূর্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় তার সকল বিপদ নষ্ট হয়।

প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যান্তি তমঃ সূর্য্যোদয়েযথা।।

চঞ্চলচিত্তে অধিকক্ষণ সমাধি (সবিকল্প) স্থায়ী হয় না। ছাদ হতে যেমন নিম্ন সোপানে অবতরণ হয়, ঠিক তেমন ব্রহ্ম ভাবনা হতে সংসারে অবতরণ হয়। তখন প্রথমত বিপদ-আপদের কথা মনে আসে। বিপদ-আপদ ঘটলে তো ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ কিছুই সিদ্ধ হয় না, সেজন্য দুর্গার স্মরণ। দুর্গা ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি সেই ভগবতী সংসার অর্থাৎ সৃষ্টির আদি কর্ত্রী ও অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সুতরাং প্রথমেই তাঁর স্মরণ। শাস্ত্রে দুর্গানাম স্মরণের কথা বলা হয়েছে। তাঁর রূপ তো দেখবার বা ভাববার শক্তি নাই, নাম করতে করতে এই একান্ত ভক্তির উদয় হলে তিনিই তাঁর রূপ দেখান।

বৈদিক যুগেও দেবীর এই রূপ সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যায়— কেনোপনিষদের ঋষির চোখে বহু পূর্বে সুরলোকে দেবাসুর সংগ্রামে গর্বিত দেবতাদের সম্মুখে 'উমা', 'হৈমবতী' রূপে তাঁর প্রথম প্রকাশ। শক্তি সচেতন বায়ু, অগ্নি প্রমুখ দেবগণ ব্রহ্মপুরুষের সামনে শক্তিপ্রদানে যখন ব্যর্থ, তখনই হঠাৎ নীল আকাশের বুকে বিদ্যুৎবর্ণা উমার আবির্ভাব—

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম
বহু শোভমানাম্ উমাম্ হৈমবতীম্।।

এই দেবী (বাক্‌নাম্নী দেবী) ব্রহ্মকে স্বীয় আত্মারূপে অনুভব করে ঋক্ মন্ত্রে আত্মপরিচয় ঘোষণা করেন।

'অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহম্...'।

দুর্গাসপ্তশতী বা দেবীমাহাত্ম্য মূলত বেদ্‌ভিত্তিক। এর তিনটি চরিত্রের প্রথমটি ঋগ্বেদস্বরূপা, মধ্যম চরিত্রটি যজুর্বেদস্বরূপা, উত্তর চরিত্রটি সামবেদ স্বরূপা।

বাল্মীকি রামায়ণে শারদীয়া দুর্গাপূজার কথা উল্লেখ না থাকলেও কৃত্তিবাস তাঁর বাংলা রামায়ণে দেবী দুর্গার আবাহনের ঘটনাটি কারণ সহ তুলে ধরেছেন। কিন্তু না, রামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য দেবীর অকালবোধন করেন, তা কৃত্তিবাসের কপোল কল্পিত নয়। কারণ, এই ঘটনাটির পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন দেবীর বোধন পূজায় এই মন্ত্রটি।

'ওঁ ঐঁ রাবণস্য বধার্থায়, রামস্যানুগ্রহায়চ..।'

বৃহন্নারদীয় পুরাণে সেই দেবী উমা, শক্তি, লক্ষ্মী ইত্যাদি নামে উক্ত হয়েছেন— 'উমেতি কেচিদাহুস্তাম্, শক্তি লক্ষ্মীংতথাপরে..।'

ইতিহাসও দুর্গা সম্বন্ধে বাঙ্ময় ছিল। মহাভারতে একাধিকবার দুর্গা স্মরণের উল্লেখ আছে। অজ্ঞাতবাসের সাফল্যের জন্য বিরাটপর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির দেবী দুর্গার স্বরচিত স্তব পাঠ করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে যুদ্ধজয়ের জন্য শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন (স্বরচিত) দুর্গার স্তোত্র পাঠ করেন। বৌদ্ধধর্মের মারীচি দেবীও দশভুজা।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, ব্রজবালারা ব্রজের অধিষ্ঠাত্রী কাত্যায়নী দুর্গার কাছে তাঁদের কাতর প্রার্থনা জানিয়েছেন, নন্দগোপসুত শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়া জন্য।

'...নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ।'

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মেধা ঋষির স্তুতিতে ইনি—

'দেবী, আপনি সর্ব কার্য ও কারণ স্বরূপিণী, সর্বেশ্বরী, সর্বশক্তিময়ী দুর্জ্ঞেয়। সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তি সমন্বিতে...'। ইনি (দেবী) সর্বজ্ঞা ও সর্বস্থিতা (She is omniscient and omnipresent)। দেবতাদের স্তুতিতে এই চিচ্ছক্তি, চেতনা বুদ্ধি-নিদ্রা-ক্ষুধা-ছায়া-শক্তি-তৃষ্ণা-ক্ষান্তি--জাতি-লজ্জা-শান্তি-শ্রদ্ধা-কান্তি-লক্ষ্মী-বৃত্তি-স্মৃতি-দয়া-মাতা-তুষ্টি-ভ্রান্তিরূপে

সর্বজীবে বিরাজমানা।

'যা দেবী সর্বভূতেষু...।'

বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণের মতে প্রাকৃতিক নয়টি ভেষজে ব্রহ্মাণী প্রমুখ নয়টি দেবীর অবস্থান। সম্মিলিত রূপে যিনি নবপত্রিকা (কলা বউ) বাসিনী নবদুর্গারূপে খ্যাতা। আবার দেবীর ধ্যানে (জটাজুট সমাযুক্তাং..)-র একেবারে শেষভাগে বলা হয়েছে— উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা প্রমুখ অষ্টশক্তিগণে যিনি সর্বদা পরিবেষ্টিতা সেই ধর্ম-অর্থ-কাম -মোক্ষদাত্রী জগতের ধাত্রী সর্বদা চিন্তনীয়া। এই অষ্টশক্তি পরিবৃতা ভগবতী নবদুর্গারূপে প্রকাশমানা।

প্রসঙ্গত বলা যায়, বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ বলে সেটিই এখানে ঘটেছে। অর্থাৎ দেবী দুর্গার শক্তি এই অষ্টশক্তির মধ্যে বিকেন্দ্রীকৃত।

এখন দেখা যাক তন্ত্রের দৃষ্টিতে ইনি কেমন। বিশ্বসারোদ্ধার তন্ত্রে দেবী প্রকৃত অর্থেই ত্রাণকর্ত্রী, এখানে বলেছে, 'তুমি (দেবী) নিরাশ্রয়, দীন, তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্ত, ভীত ও বদ্ধজীবের একমাত্র গতি ও নিস্তারকারিণী। মুণ্ডমালা তন্ত্রে দেবীর পরস্পরবিরোধী চরিত্র তথা রূপগুলি দেখা যায়। এখানে তিনি সাকারা আবার নিরাকারাও, অব্যক্তা আবার ব্যক্তরূপাও।

ভগবান শঙ্করই (শিব) যাঁর একমাত্র আরাধ্য দেবতা সেই শিবগত প্রাণ আচার্য শঙ্কর (শঙ্করাচার্য) তাঁর দেব্যপরাধক্ষমপণ স্তোত্র দেবীর উদ্দেশে বলছেন, '... এখনও যদি আমার প্রতি দয়া না কর হে লম্বোদর জননী। নিরাশ্রয় আমি আর কার শরণ নেব?'

'... নিরালম্বো লম্বোদর জননি কং যামি শরণম্।'

নির্বিঘ্নে গ্রন্থসমাপ্তির জন্য মহাকবি কালিদাস এই দেবীর (তিনি অবশ্য শিব শিবানীর) শরমাগত— 'জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী পরমেশ্বরৌ।।' রঘুবংশ ১/১।।

সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন দেবীকে দেখেছিলেন বাঙ্গালি ঘরের একেবারে আটপৌরে কন্যার চোখে। তাঁর আগমনী গানে লিখলেন— 'এবার উমা এলে আর উমাকে পাঠাব না...।'

একইভাবে বিদ্রোহী কবি নজরুলও গাইলেন 'এবার নবীন মন্ত্রে হবে, জননী তোর উদ্বোধন। নিত্যা হয়ে রইব ঘরে, হবে না তোর বিসর্জন...'।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র দেশমাতৃকাতে বিশ্বমাতৃকার (দশপ্রহণধারিণী দুর্গার) রূপ আরোপ করেছেন— 'বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি। তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।। 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী'। ঋষি অরবিন্দ দেশের ঘোর সঙ্কটকালে দেবীকে প্রার্থনা জানালেন কাতরভাবে 'মাতঃ দুর্গে! স্বার্থে ভয়ে ক্ষুদ্রাশয়তায় ম্রিয়মান ভারত। আমাদের মহৎ কর, মহৎ প্রয়াসী কর, উদারচেতা কর, সত্যসঙ্কল্প কর। আর অপ্লাশী, নিশ্চেষ্ট, অলস, ভয়ভীত যেন না হই।'

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ভাবনায়ও জগন্মাতা ও দেশমাতা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছেন। তাই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো 'ও আমার দেশের মাটি তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা। তোমাতে বিশ্বময়ী, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা...'।

আবার প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তা চেতনায় জগদম্বা, গর্ভধারিণী তথা সমগ্র মাতৃজাতির (তাঁর জাগতিক নারী কল্যাণমূলক কাজই নিদর্শন স্বরূপ) মধ্যেই অন্তর্লীনা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বিদ্যাসাগর মহাশয়ই হলেন এই চিন্ময়ী শক্তির প্রকৃত সাধক। ঋষি বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, সাধক রামপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের মাতৃবন্দনাকে বিজ্ঞানের কথায় Transformation of power বা শক্তির রূপান্তর বা রূপান্তরিত শক্তির সাধনা বলা যায়।

সংস্কৃত কবি মাঘ তাঁর 'শিশুপাল বধম্' মহাকাব্যে নারদের স্বর্গ থেকে অবতরণের দৃশ্যটি একটি শ্লোকের মাধ্যমে অবতারণা করেন— 'চয়স্তিষামিত্যবধারিতং পুরা...'। সমগ্র শ্লোকটির অর্থ— শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে 'তেজপুঞ্জ' বলে নিশ্চয় করলেন পরে আকৃতি দেখে 'শরীরধারী' বলে মনে করলেন তারপরে পৃথক পৃথক ভাবে মুখ হাত-পা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শ্মশ্রু-গুম্ফ (গোঁফ-দাড়ি) দেখে পুরুষ বলে স্থির করলেন ক্রমে ওই ব্যক্তিকে 'নারদ' বলে জানতে পারলেন।

ঠিক একইভাবে বলা যেতে পারে, 'দুর্গাভাবনা : বেদ থেকে বর্তমান প্রসঙ্গে, যে দেবী প্রথমে নীলবর্ণ আকাশের বুকে বিদ্যুৎবর্ণা (তেজঃ পুঞ্জ নিজেকে প্রকট করেছিলেন মাত্র। ক্রমে ক্রমে পুরাণ তন্ত্রে যাঁর মুখ-হাত-পা (ক্রিয়াকলাপ) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল প্রকাশ পেল বর্তমান কবি-সাহিত্যিক সাধকগণের লেখনিতে (ভাবনায়) তিনিই আমাদের একান্ত আপন উমারূপী কন্যা। ক্রমে তাঁর পূর্ণতা ঘটল বঙ্কিম-কলমে দেশমাতৃকারূপিণী সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী 'দেবী দুর্গা।'

হে ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতিরূপা সনাতনি দেবী! হে মা দুর্গে! তোমার শ্রীচরণে নিখিল বিশ্বজনগণের সমবেত প্রার্থনা হোক গুরুদেবের (রবীন্দ্রনাথের) ভাষায়—

'বরিষ ধরার মাঝে শান্তির বাণী
কেন এ হিংসাদ্বেষ? কেন এ ছদ্মবেশ?
কেন এ মান-অভিমান?
বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি...।'

दुर्गा पूजा के पावन पर्व पर मंगलमय शुभ कामनाये
विश्व स्तर के पी. टी. एफ. ई. इन्सुलेटेड वायर,
केबल व नलिका, के निर्माता।

इस पुनीत राष्ट्रीय पर्व पर संकल्प लें कि हम भारत राष्ट्र
को सशक्त, संगठित और सक्षम बनाने में सहयोग करें।

गर्ग एसोसिएट्स
प्राइवेट लिमिटेड

M/s. Garg Associates Private Limited

Regd. Office : D-6, Meerut Road Industrial Area - 3
Ghaziabad - 201 003 (U.P.) INDIA

e-mail : sales@gargasso.com

Phone : 0120-2712128/2712039

সর্বসমাবেশক হিন্দুত্ব

শ্রী রঙ্গাহরি

হিন্দুত্বের উন্মেষ

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন আধুনিককালের প্রথম সন্ন্যাসী, যিনি বিদেশযাত্রা করেছিলেন ম্লেচ্ছ-সংসর্গ সংক্রান্ত সমস্ত স্থানীয় কুসংস্কারকে অগ্রাহ্য করে। আমেরিকা, ইয়োরোপ ইত্যাদি দেশে হিন্দু ধর্মের দর্শন ব্যাখ্যা করে দেশে ফিরে স্বামীজী শ্রীলঙ্কা থেকে আলমোড়া (হিমালয়) পর্যন্ত ঘুরলেন এবং এক শাশ্বত সত্য উপলব্ধি করলেন।

স্বামীজী বললেন— 'মনে রাখবে, প্রতিটি জাতির নিজস্ব ভবিতব্য থাকে, যা তাকে পূর্ণ করতে হয়; বিশ্বকে দেবার মতো নিজস্ব কোনো বার্তা থাকে, যা তাকে প্রচার করতে হয়। সব জাতিরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য, পরিচয় এবং সত্তা থাকে।' স্বামীজীর যুক্তি ছিল এই যে, আমাদের কাজ হওয়া দরকার আমাদের জাতির নিজস্ব মূল বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে বের করা। তাঁর এই চিন্তাধারা হিন্দুত্ব দর্শনের বীজ রোপণ করে।

এরপর লোকমান্য তিলক, ঋষি অরবিন্দ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শ্রীগোলওয়ালকর এঁরা সবাই এই চিন্তাধারাকেই এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ঋষি অরবিন্দ তাঁর 'দি ফাউন্ডেশন অব ইন্ডিয়ান কালচার' গ্রন্থে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, আমাদের এই সুপ্রাচীন জাতি বহুকাল ধরে বহু অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে পরিক্রমা করার ফলে তাতে এক বিশেষ জীবনশৈলী ও দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে, যা আমাদের গৌরবময় এক সম্পদ। কয়েক শতাব্দী ধরেই এই সম্পদ আমাদের পরিচয়ের স্মারক। এই পরিচয়েরই অন্বেষণ করতে বলেছেন স্বামীজী এবং ত্রিশ বছর ধরে শ্রীগুরুজী এই চিন্তার পুনরাবৃত্তি করে গেছেন।

জাতীয় পরিচয়

আমাদের জাতীয় পরিচয়ের নাম হিন্দুত্ব। ইংরেজিতে একে হিন্দুনেস বলা যায়। ভারতের যেমন হিন্দুত্ব, তেমনই ইংলন্ডের ইংরেজত্ব, জার্মানির জার্মানত্ব, ফ্রান্সের ফরাসিত্ব ইত্যাদি। এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। হিন্দুত্ব শব্দটা অতি সহজ সরল শব্দ। কিন্তু তবুও কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে, হিন্দুত্ব কেন? ভারতীয়ত্ব নয় কেন?

হতেই পারে। 'ভারতীয়' শব্দটা নিয়ে কোনো আপত্তি নেই আমাদের। দুটো শব্দেই একই ভাবের দ্যোতনা রয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রার্থনায় 'হিন্দুভূমি' শব্দটা রয়েছে। আবার শেষে 'ভারত' শব্দটাও রয়েছে। সঙ্ঘের মতে, দুটো শব্দই গ্রহণযোগ্য ও প্রণম্য। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টা দেখতে হলে আমাদের আরও বেশি বিশ্লেষণী মনোভাবাপন্ন ও ত্রুটিমুক্ত হতে হবে।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। রসায়নশাস্ত্রের একজন অধ্যাপক রাঁধুনিকে লবণ আনতে বললে সে রান্নার নুন (রসায়নে যার নাম সোডিয়াম ক্লোরাইড) নিয়ে আসবে। কিন্তু অধ্যাপকমশাই যদি ল্যাবরেটরির কোনো সহায়ককে লবণ আনতে বলতেন, অমনি সে উল্টে জিজ্ঞাসা করত, 'কোন লবণটা স্যার? ক্লোরাইড, ফসফেট সালফেট?' অর্থাৎ 'লবণ' একটি সাধারণ নাম, কিন্তু 'সোডিয়াম ক্লোরাইড' নামটি একটি নির্দিষ্ট নাম।

ঠিক এই রকমের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে 'হিন্দুত্ব' ও 'ভারতীয়ত্ব'— এই দুটো শব্দকেই বিশ্লেষণ করতে হবে। আজকের জগতে 'হিন্দু' শব্দটা একটা সামাজিক মাত্রার ইঙ্গিত করে; কিন্তু 'ভারতীয়' শব্দটাতে রয়েছে একটা ভৌগোলিক মাত্রা। কাজে কাজেই হিন্দুত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গেলে যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন, সেটি হচ্ছে এই—

কোন দেশে হিন্দুত্ব নির্মাণ হয়েছে? কোন সমাজ হিন্দুত্ব নির্মাণ করেছে?

প্রথম প্রশ্নটির উত্তর : ভারত। দ্বিতীয়টির উত্তর : হিন্দু সমাজ। দুটি উত্তরই যথাক্রমে ভৌগোলিক এবং সামাজিক অর্থে সঠিক, কিন্তু প্রথমটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরিষ্কার

বাল গঙ্গাধর তিলক

নয়। উপনিষদ গ্রন্থাবলীকে 'আরণ্যক' বলা হয়, যদিও জঙ্গল এদের রচনা করেনি, সব রচনা করেছিলেন মহাঋষিগণ। যাঁরা জঙ্গলে বাস করতেন। ঠিক একইভাবে বলা যায়, অপরিহার্য মূল্যবোধগুলো ভৌগোলিক ভারতে সৃষ্ট হয়েছিল বটে, কিন্তু তাদের সৃষ্টি করেছিল 'হিন্দু' নামক এক সমাজ।

কাজে কাজেই 'হিন্দুত্ব' শব্দের আলোচনায় 'ভারতীয়' শব্দটি হচ্ছে 'লবণ' শব্দটির মতোই সাধারণ একটি শব্দ। বৈজ্ঞানিক নির্দিষ্টতা বা স্পষ্টতা এই 'ভারতীয়ত্ব' শব্দটিতে নেই, যা আছে 'হিন্দুত্ব' শব্দটিতে।

আরও প্রাঞ্জল করে বোঝানো যাক। ভগবান রামচন্দ্রের পত্নীর তিনটি নাম আছে— মৈথিলী, জানকী, সীতা। তাঁর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশে একদল সাংবাদিক মিথিলায় গিয়ে শহরের দ্বারপালকে শুধোলো : 'ভাই, আমরা বহু দূর থেকে এসেছি, দ্বারকা থেকে, মৈথিলীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। মৈথিলীর বাড়ি কোনটা?' দ্বারপাল বললে : 'ভাইসব, মিথিলার সব মেয়েই মৈথিলী, কোনজনকে চাও তোমরা?' তখন সাংবাদিকদের একজন বললে : 'জানকী', আর অমনি দ্বারপাল হাত জোড় করে শ্রদ্ধাভরে বললে : 'ওঃ, রাজকুমারীর কথা বলছেন আপনারা! জনক রাজার মেয়ে। আপনারা ওইদিকে রাজপ্রাসাদে চলে যান।' রাজপ্রাসাদে গিয়ে জানকীর খোঁজ করতেই প্রহরীরা বলল : 'জনক রাজার চার মেয়ে। আপনাদের কাকে চাই?' সাংবাদিকরা বললে : 'চার মেয়ে? তাঁদের নাম কী?' তখন প্রহরী বললে : ঊর্মিলা, শ্রুতকীর্তি, মাণ্ডবী আর সীতা।' শুনেই সাংবাদিকরা সমস্বরে বলে উঠল : 'সীতা! সীতা!' এরপর কিন্তু প্রাসাদে ঢোকার পর আর কেউ জিজ্ঞাসা করল না কোন সীতা? কারণ 'সীতা' শব্দটি সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট।

এর অর্থ হচ্ছে, সাধারণ অস্পষ্টতা থেকে নির্দিষ্ট স্পষ্টতায় পৌঁছলে তবেই সত্যে উপনীত হওয়া যায়। সেই সত্যের আর কোনো নড়চড় হয় না। ঠিক একই ভাবে, 'ভারতীয়ত্ব' কথাটি ভুল না হলেও নির্দিষ্টভাবে এবং সঠিকতর উত্তর হচ্ছে 'হিন্দুত্ব'।

হিন্দুত্বের স্বরূপ এবং প্রকাশ

আমাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবনে হিন্দুত্ব অতি সহজ ও সাধারণভাবে প্রকট হয়। এই প্রকাশ এতই সাবলীল ও অনায়াস যে, একে অবদমন করতে গেলেই বরং সক্রিয় প্রচেষ্টা করতে হয়। এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের কয়েকটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে।

১) ভারত স্বাধীন হবার পর আমাদের জাতীয় নেতারা একটা স্লোগান বা ওই ধরনের কোনো অর্থবহ বাক্যাংশ খুঁজতে উপনিষদের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। 'সত্যমেব জয়তে', 'যোগক্ষেম বহাম্যহম্', 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' ইত্যাদি বাক্যাংশগুলো তাঁদের নজরে এল। এগুলো অনায়াসে গ্রহণযোগ্য হয়ে গেল এবং আজ আমরা এই কথাগুলো অহরহ ব্যবহার করি।

২) অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া ১৯৫৭ সালে কেরলে ক্ষমতায় আসার পর তার মুখ্যমন্ত্রী ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ নিমন্ত্রিত হয়ে চীনে গেলেন। তিনি চীনের চেয়ারম্যান মাও-সে-তুং-এর জন্য উপহার নিয়ে গেলেন নটরাজের একটা মূর্তি। কেন? কারণ, তাঁর মনের কোনো এক অজানা কোণে ভারতীয়ত্বের গর্বের সঙ্গে ভেসে উঠেছিল হিন্দুত্ব।

৩) স্বাধীনতার পর ভারত গণতান্ত্রিক হিসেবে ঘোষিত হবার পর 'পরমবীর চক্র' দেওয়া শুরু হলো। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেই চক্রটির নকশা করেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক শ্রী বিক্রম খানোলকারের স্ত্রী সাবিত্রী দেবী। সাবিত্রীর বাবা ছিলেন হাঙ্গেরীয়, আর মা ছিলেন রুশ। সাবিত্রী কিন্তু নিজে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সমাজে মিশে গিয়ে ভগিনী নিবেদিতার মতোই ভারতকন্যা হয়ে গিয়েছিলেন। পরমবীর চক্র দেওয়া হয় অসাধারণ শৌর্যের সম্মান ও স্বীকৃতি হিসাবে। উপহার ফলক এই চক্রের একদিকে থাকে দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র।

৪) আর একটি অসাধারণ উদাহরণ। আমাদের গণতন্ত্রের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ভারত সরকার একটা ডাকটিকিট বের করেছিল। তাতে একটি সংস্কৃত শ্লোক ছিল, যেটি সংসদ ভবনের গম্বুজের ভিতর দিকে খোদিত রয়েছে। বলা যায়, ওই শ্লোকটি সংসদের মৌলিক নীতি। সংসদের সদস্যদের আচরণবিধি বেঁধে দেওয়া

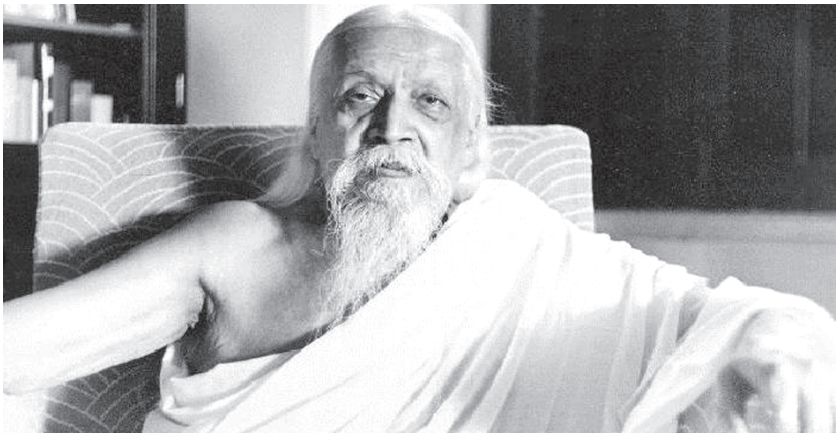

ঋষি অরবিন্দ

হয়েছে এই শ্লোকে। বলা হয়েছে, সাংসদরা সংসদ কক্ষে ঢুকবেন কিনা সেটা তাঁরই বিবেচ্য, কিন্তু যদি তিনি ঢোকেন, তবে তাঁকে সত্য কথা বলতে হবে। যদি তিনি মিথ্যা বলেন বা সদস্যদের কোনো আলোচনায় সত্য গোপনের উদ্দেশ্যে চুপ করে থাকেন, তবে তিনি পাপকার্য করবেন এবং সংশ্লিষ্ট সদস্যরাও পাপী হবেন। শ্লোকটি নিম্নরূপ—

সভাং বা ন প্রবেষ্টব্যং বা ন সমঞ্জসম্।
অব্রুবন বিব্রুবন বাহপি নরো ভবতি কিল্বিষী।।
(মনু. ৮.১৩)

শ্লোকটি লিখেছিলেন মনু। এতে কি কোনো সম্প্রদায়, কোনো আচার-উপাচার বা কোনো দেবতা ইত্যাদির উল্লেখ আছে? আসলে এতে রয়েছে নিখাদ জনস্বার্থে আত্মশাসনের আদেশ। এমনকী একজন নাস্তিকের জন্যও এই আদেশ সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য।

ঠিক এই কথাই তাঁর আত্মজীবনীতে (১৭শ অধ্যায়) লিখেছিলেন পণ্ডিত নেহরু : হিন্দুত্ব তার সন্তানদের আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে রাখে, তা তারা যেমনই হোক না কেন।

হিন্দুত্ব একমুখী নয়

হিন্দুত্ব সম্পর্কে এই চিন্তাধারা ক্রমাগত বহমান, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ঐতিহাসিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে সমাজে বয়ে চলেছে। হিন্দুত্বের উপলব্ধি নানা অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ এবং এর নানান দিক রয়েছে। জীবন নিজেই যেমন সময়ের প্রবাহে বিবর্তিত হয়ে অসংখ্য প্রকারের রূপ ধারণ করতে পারে, ঠিক তেমনই হিন্দুত্বের বর্ণালীরও হাজারও রূপ, যার অনুভব হতে পারে ব্যক্তিগত স্তরে, কিংবা সমাজ বা জাতীয় ভাবধারার স্তরে। যত দীর্ঘকাল বহমান থাকবে এই ভাবধারা, ততই এর পরিবর্তন, পরিমার্জন হতে থাকবে। আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হিন্দুত্বের এই বহুমুখিতার একটিমাত্র দিকের উল্লেখ করব আমি, সেই দিকটি হলো : হিন্দুত্ব ও বিনোদন।

সাপ-লুডো খেলা সারা ভারতে প্রচলিত। এখন তো এর বোর্ড ক্রীড়া সামগ্রীর দোকানেও পাওয়া যায়। এই খেলাটি বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন নামে চলে। কেরলে এর নাম 'বৈকুণ্ঠ', তামিলনাড়ুতে এর নাম 'মুক্তিপট্টম', অন্ধ্রে 'পরমপদপটম্' ইত্যাদি। জম্মুতে প্রবাস করার সময় আমি এই খেলাটা খুঁজেছিলাম। পেয়ে গেলাম ডোগরা আর্ট মিউজিয়ামে। লক্ষণীয় এই যে, ওই খেলার ইংরেজি বোর্ডে সাপের মুখে পড়লে নীচে তার লেজে নেমে আসতে হয়, আর মই ধরতে পারলে ওপরে উঠে যাওয়া। কখন কোথায় পড়তে হবে তা পুরোপুরিই ভাগ্যের হাতে। ভারতীয় বোর্ডগুলো কিন্তু তেমন সাদামাটা নয়। এখানে সাপের মুখে বিশদ করে লেখা থাকে কিছু অন্যায় বা খারাপ কাজের উদাহরণ (যেমন : চুরি, অপহরণ ইত্যাদি), আর মই বা সিঁড়ির গোড়ায় লেখা থাকে কোনো গুণের বর্ণনা (যেমন : দয়া, অন্নদান ইত্যাদি)। বার্তাটি পরিষ্কার—গুণের পুরস্কারে তুমি উচ্চমার্গে আরোহণ করবে, আর দোষ বা অন্যায়ের প্রতিফলস্বরূপ তোমার পতন হবে। খেলার শেষ ধাপে পৌঁছতে পারলে নির্বাণ অর্থাৎ তুমি মুক্ত। ভারতীয় এই খেলায় বিনোদনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের গতিপথ ও পথপার্শ্বস্থ সুবিধা বা অসুবিধা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যেতে থাকে। খেলতে খেলতে তুমি একটা চিরন্তন সত্য বুঝে যাও যে, কেবলমাত্র ভাগ্যই নয়, তোমার জীবন নির্ধারিত হবে তোমার কৃতকর্মের দ্বারাও।

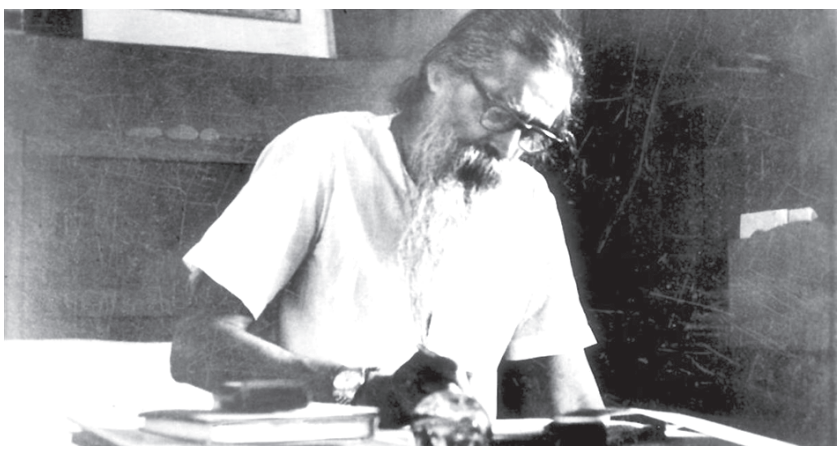

শ্রীগুরুজী

আধুনিক গতিময় জীবনে হিন্দুত্বের প্রাসঙ্গিকতা

আধুনিক জগতে কোনো দর্শনই একটি পরিসরে আবদ্ধ থাকতে পারে না। তাই হিন্দুত্বও শুধুমাত্র ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুত্বও অগ্রসরমান। প্রশ্ন হচ্ছে, হিন্দুত্ব কি আধুনিক জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে? যদি না পারে, তবে সে কালের নিয়মেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তবে আমি নিশ্চিত, এরকম কিছু ঘটবে না, কেননা ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে।

ক) মানবাধিকার বিষয়টা ধরা যাক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে, ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ সাল। জাতিসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশন মানবাধিকারের বিষয়ে একটা ঘোষণাপত্র প্রকাশ করল। সেটা মানবজাতির ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দলিল বলে গণ্য করা হয়। এর ১৪ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে— 'নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা এবং সেই উদ্দেশে যে কোনো রাষ্ট্রে আশ্রয় নেওয়া মানুষের অধিকার।' এবার ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা কী দেখি? ৬৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইহুদিরা রোমানদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে কোথায় আশ্রয় পেয়েছিল?

৪র্থ শতাব্দীতে ক্যানিনীয় খ্রিস্টানদের কে সুরক্ষার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল? ৮ম শতাব্দীতে মুসলমানদের হাতে অত্যাচারিত পারসিদের কে রক্ষা করেছিল? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমাদের সবার জানা। তখন কোথায় ছিল ১৯৪৮ সালের মানবাধিকারের ওই মহামূল্যবান দলিল? মানবাধিকারের অনুভব হিন্দুত্বের অন্তরে বহুকাল আগে থেকেই ফল্গুধারার মতো প্রবহমান ছিল, যার ফলে মহানারায়ায়ণোপনিষদে লেখা হয়েছিল---'यत्र विश्वं भवत्येकनीडं'

এর অর্থ হচ্ছে, এই ধরিত্রী একটি বৃহৎ নীড়, যাতে সমস্ত প্রাণী একসঙ্গে থাকতে পারে। এই মহৎ চিন্তাধারা হিন্দুত্বের অবদান এবং হিন্দুত্বের প্রয়োগ। হিন্দুত্বের চোখে এই পৃথিবী বৈশ্বিক গ্রাম নয়, এক বৈশ্বিক পরিবার। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' হচ্ছে ঐ বৈশ্বিক পরিবারের ঘোষণা, বসুধৈব গ্রামকম্ নয়; বৈশ্বিক গ্রাম শুধু একটি ভৌগোলিক ধারণা মাত্র। গ্রামের ধারণা আসে ভূগোল থেকে, কিন্তু পরিবারের অনুভব আসে হৃদয় থেকে।

খ) পরিবেশ বিষয়েও ওপরের কথাগুলো সত্যি। 'প্রকৃতি মানুষের উপভোগের জন্য' এই আত্মসর্বস্ব ভোগবাদী জীবনযাত্রার বিষময় ফল দেখে সন্ত্রস্ত পশ্চিমের দেশগুলো আজ 'পরিবেশ-বান্ধব' 'পরিবেশ-বান্ধব' বলে চিৎকার করছে। হিন্দুত্ব প্রকৃতির সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্কে সহাবস্থান করে। দার্শনিক কবি ভর্তৃহরি প্রকৃতির পাঁচটি অঙ্গকে পারিবারিক সম্পর্কে বন্দনা করেছেন:

माता मेदिनि तात मारुत, सखे तेजः सुबन्धोजल।
भ्रातर्व्योम निबद्ध एव भवतामन्त्यः प्रणामांजलिः।।
(वैराग्यशतक – १००)

এর অর্থ হচ্ছে— 'হে মাতা মেদিনী, পিতা মরুৎ, সখা অগ্নি, কুটুম্ব জল এবং ভ্রাতা আকাশ— তোমাদের সকলকে প্রণাম। তোমাদের সৎসঙ্গের ফলেই আমার সমস্ত সাফল্য।'

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আধুনিক জগতে হিন্দুত্ব অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গতিশীল; নিজ ভারে চলৎশক্তিহীন বা গোঁড়ামিতে আবদ্ধ নয়। তার নিজস্ব গুণই এই যে, সে সর্বদা নতুন চিন্তাধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, যা বহুবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে। হিন্দুত্বের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো বিরোধ নেই। ভৌতিক বা আধ্যাত্মিক কোনো স্তরেই সে কখনো সত্যের অন্বেষণে বাধা সৃষ্টি করেনি। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ভিত্তিক নতুন অভিজ্ঞতা সর্বদাই এতে গৃহীত হয়েছে। আদি শঙ্করাচার্য তো বলেই ছিলেন, 'শত উপনিষদ যদি বলে আগুন আসলে ঠাণ্ডা এবং তাতে আলো নেই, তবে আমি ওইসব শাস্ত্র ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করে সত্য জেনে নেবো।' অন্যের অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান নয়, সর্বদা নিজস্ব অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেওয়া জ্ঞানের অগ্রাধিকারই দেওয়া হয়েছে এতে। কোনো সময়ে এমনটি ভাবা হয়নি যে, সর্বজ্ঞানের চূড়ান্ত আধার হিন্দুত্ব এবং নতুন কিছুই এতে যোগ করার নেই। বরং আমরা মনে করি যে, মানবপ্রজ্ঞা বিরামহীন একটি প্রক্রিয়া; আকাশে উড্ডীন পাখীর বা জলে সন্তরণরত মাছের যেমন কোনো বন্ধন নেই, তেমনই এরও কোনো প্রতিবন্ধক নেই, নেই কোনো পুনরাবৃত্তি বা পরিসমাপ্তি।

(शकुनीनामिवाकाशे, मत्स्यानामिव सागरे, यथा पदं न दृश्येत तथा वेदविदां गतिः)

এর ফলে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী হিন্দুত্বের দাবিদার নয়; সত্যের অন্বেষণে নিয়োজিত যে কোনো মানুষই একে নিজের বলে গ্রহণ করতে পারে। হিন্দুত্বের একটি মৌলিক তত্ত্ব এই যে, মানবজাতি যতদিন থাকবে, ততদিন এর বহুধা রূপ, প্রকরণ, প্রকৃতি ইত্যাদির বিবর্তন হতেই থাকবে, কেননা তা হিন্দুত্ব সদা গতিশীল ঃ 'চরৈবেতি, চরৈবেতি'।

সমাজ হচ্ছে কৃষ্টির প্রেরণা এবং পাথেয়। তাই সমাজের কাছে জরুরি কাজ হচ্ছে প্রতিকূল সমস্ত পিছুটান থেকে মুক্ত হয়ে তার নিজস্ব ভবিতব্য পূর্ণ করার কাজে নিজেকে নিয়োগ করা, যে কাজের আয়ুধ হচ্ছে হিন্দুত্বের পূর্ণ উপলব্ধি।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক।
অনুবাদক - ডা:উচ্ছল কুমার ভদ্র, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ)

কালজয়ী বিদ্যাসাগর

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

এবছর থেকে শুরু হয়েছে বাঙ্গালির অহংকার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত-জন্মোৎসব। তারই প্রাক্কালে এই প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্বের উদ্দেশে আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

কলেজের ছেলেরা রীতিমতো উত্তেজিত। আজ একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। রোজ এসব চলতে পারে না। ঝোলায় ভরে, পকেটে করে ইটপাটকেল নিয়ে আসছে তারা। জমা করছে সংস্কৃত কলেজের ছাদের বিভিন্ন কোনায়। হিন্দু স্কুলের ছেলেদের এ বার আর ছেড়ে দেওয়া যাবে না। সংস্কৃত কলেজের গা ঘেঁষে একমাত্র ওদেরই বাড়ি। আর স্কুলে যেতে গেলে ঢুকতে হবে সংস্কৃত কলেজের গেট দিয়েই। এবার যাবি কোথায় বাছাধন! কথা নেই বার্তা নেই কলেজের দাদাদের অপমান! যা মুখে আসে ছোঁড়াগুলো তাই বলছে। কীসের এত গুমর?

দেখতে দেখতে লেগে গেল যুদ্ধ। ছাদের পাঁচিলের বিভিন্ন পয়েন্টে পজিশন নিয়েছিল সংস্কৃত কলেজের ছেলেরা। হিন্দু স্কুলের ছাত্ররা গেট পেরিয়ে কলেজ চত্বরে ঢুকতেই উড়ে আসতে লাগল ক্ষেপণাস্ত্র। ছোট বড় মাঝারি নানা মাপের ইটপাটকেল। নিশানা একেবারে মোক্ষম। কারও গায়ে লাগছে, কারও হাতে লাগছে, কারও বা সোজা মাথায়। ছেলেরা ছুটে পালাচ্ছে, কেউ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ছে, কেউ আবার ঢিলগুলো কুড়িয়ে নিয়ে প্রাণপণে ছুঁড়ছে তিনতলায় ছাদের দিকে।

কলেজের স্যারেরা অনেকক্ষণ ঢুকে গেছেন টিচার্স রুমে। প্রিন্সিপাল বিদ্যাসাগর মশাই কলেজে এসেছেন তারও আগে। সুতরাং স্যারেদের আহত হবার আশঙ্কা নেই। মনের সুখে জমিয়ে রাখা ইটপাটকেলের সদ্ব্যবহার করতে লাগল সংস্কৃত কলেজের ছেলেরা। মারামারি চলতে লাগল পুরোদমে।

বিদ্যাসাগর মশাই নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এসে দাঁড়ালেন দরজা ঘেঁষে। সামনে লম্বা বারান্দা, সারি সারি থাম আর রোদবৃষ্টি ঠেকানোর ঝরোখা। ওপরে ছাদ থেকে ইটবৃষ্টি হচ্ছে। নিচ থেকে জবাব আসছে দুটো-চারটে। সঙ্গে চিৎকার আর গালাগালি। বিদ্যাসাগর মশাই একবার ওপরে তাকাচ্ছেন। একবার নিচে উঁকি মেরে দেখছেন। ইতিমধ্যে দেওয়াল ঘেঁষে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের ঘরের পাশে এসে জড়ো হয়েছেন অন্য শিক্ষকরা। সকলেই উদ্বিগ্ন—এই মারামারি যে কতদূর গড়াবে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কমার তো কোনও লক্ষণই নেই! শুধু প্রিন্সিপাল সাহেবের ভাবান্তর নেই। তিনি কেবল লক্ষ্য রাখছেন দু-দল ছাত্রের মধ্যে কারা জেতে, কারা হারে।

এমন মারামারি প্রায়ই বাঁধত সেকালের সংস্কৃত কলেজে। অবস্থা এক একদিন এমন গুরুতর হত যে বাধ্য হয়ে পুলিশ ডেকে আনতে হত। পুলিশ এসে লাঠি উঁচিয়ে নিয়ন্ত্রণে না আনলে মাথা বাঁচিয়ে বাড়ি ফিরতেই পারত না সাতে-পাঁচে না থাকা নির্বিরোধী ছাত্রের দল।

২

বিদ্যাসাগর মশাই যখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল, সেই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন ছিল না। এখন যেখানে কলেজ স্ট্রিট কফিহাউস, সেই অ্যালবার্ট হলের দোতলায় বসত প্রেসিডেন্সির ক্লাস। নীচের তলায় দু-তিনটে ঘরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসতেন অধ্যাপকরা। বিদ্যাচর্চার স্থানাভাব এত বেশি ছিল যে, শোনা যায় পরপর বেশ কয়েক বছর গড়ের মাঠে তাঁবু খাটিয়ে ছাত্রদের এন্ট্রান্স পরীক্ষা নিতে হয়। পড়াশোনার উপযুক্ত ভবন বলতে তখন ছিল শুধু সংস্কৃত কলেজ বিল্ডিং। আর তার গা-ঘেঁষা হিন্দু স্কুল। তবে সেকালের কলকাতা শহরে জ্ঞানচর্চার সঙ্গে জড়িত মানুষের কোনও অভাব ছিল না। বিদ্যাসাগর তো ছিলেনই। তাঁর পাশাপাশি ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ— এমন আরও অনেকে। সেকালের নির্মীয়মাণ বাংলা সাহিত্যে এঁরা সকলেই ছিলেন দিকপাল বলে গণ্য হবার যোগ্য। কিন্তু কী এমন ঘটল যাতে এতজন প্রতিভাবান বাঙ্গালি বহু যোজন পিছনে পড়ে রইলেন। আর একার দাপটে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন খেটো ধুতি আর ফতুয়া পরা খর্বাকৃতি একটি মানুষ, যাঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর? কী ছিল এই জেদি একগুঁয়ে ব্রাহ্মণপুত্রের মধ্যে, যা অন্য কারোর মধ্যে ছিল না? কোথায় তাঁর অনন্যতা যার জোরে তিনি এভাবে আলাদা হয়ে উঠেছিলেন জ্ঞানচর্চা আর সমাজ সংস্কারের সেই জটিল সময়ে?

বিদ্যাসাগরের যে ভাবমূর্তিটি প্রায় দুশো বছর পরেও বাঙ্গালির চিন্তায় চেতনায় একই রকমভাবে বাসা বেঁধে আছে— সেটা তাঁর দ্বৈত রূপ। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর ভাষায়, একদিকে ভয়ানক কঠোর বীর্যের একটি মূর্তি, বিরাট এবং সুদৃঢ়; অন্যদিকে বেদনার অশ্রুব্যাকুল মন্দাকিনী।

আর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যেমন দেখেছেন— ''এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মতো একটা কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মানুষের কীরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। সেই উগ্র পুরুষকার.. সেই উন্নত মস্তক.. সেই উগ্র বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল, তাহার বঙ্গদেশে আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে সন্দেহ নাই।''

সেই উগ্র পুরুষকার এবং উন্নত মস্তকের অধিকারী মানুষটি যখন শহরের এক বিখ্যাত কলেজের অধ্যক্ষ, তখন সেই ভূমিকাতেও তিনি যে অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে উঠবেন — এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর ছিলেন ভয়ানক গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। তাঁর মনের গভীরে কৌতুক, রসিকতা আর সহানুভূতির যে টলটলে দিঘি ছিল, যার প্রমাণ জীবনভর বারেবারেই পাওয়া গেছে, কলেজ কম্পাউন্ডে পা দেওয়ামাত্র সেই স্নিগ্ধ উজ্জ্বল পরিচয়টিকে তিনি চৌকাঠের বাইরে রেখে আসতেন। বদলে পরে নিতেন ভয় ধরানো গাম্ভীর্যের এমন এক বর্ম যে, তাঁর দিকে তাকানো মাত্র ছাত্রদের বুক শুকিয়ে যেত। আটপৌরে পোশাক পরা খর্বাকৃতি মানুষটি কোনও বেচাল সহ্য করবেন না—এটা বুঝতে খুব বেশি বুদ্ধির দরকার হতো না। তাঁর বলিষ্ঠ হাঁটাচলা, থমথমে মুখ আর কড়া শাসকের দেহভঙ্গি কাজ করত প্রায় ম্যাজিকের মতো। দুটো পিরিয়ডের মাঝখানে, অধ্যাপক বা পণ্ডিত মশাইরা যখন ক্লাসে নেই, ছাত্ররা স্বভাববশেই একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করায় কলেজজুড়ে একটা গোলমাল ছড়িয়ে পড়ত। বিরক্ত বিদ্যাসাগর বারান্দায় বেরিয়ে

চিৎকার করে বলে উঠতেন 'আস্তে'।

ব্যস, মুহূর্তে পুরো কলেজ নিস্তব্ধ।

৩

যদি তাঁর কানে যেত ক্লাসের দুটো ছেলে পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া-মারামারি করছে, দুজনকেই ডেকে পাঠিয়ে সতর্ক করে দিতেন বিদ্যাসাগর। এতেও কাজ না হলে ফের দুজনকে ডেকে বহিষ্কারের কাগজ ধরিয়ে দিতেন। প্রশাসন চালাতে বিন্দুমাত্র দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতেন না তিনি। প্রশাসক হিসাবে এতটাই কঠোর আর নিরপেক্ষ ছিলেন যে, সহপাঠীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের দায়ে নিজের ছেলেকেও কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিতে দ্বিধা করেননি। সংস্কৃত কলেজেরই এক অধ্যাপক নাকি বলেছিলেন, বিদ্যাসাগর আমার ছাত্র ছিল ঠিকই, কিন্তু ওকে আমার বড় ভয়। কথা বলতে সুবিধে লাগে না। কে জানে বাবা কখন ধমকে ওঠে!

পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক। দেখতে ভারী সুন্দর, তার ওপর সুরসিক। রঘুবংশম্ পড়ানো শেষ হলে তিনি নিজে থেকেই ছেলেদের মেঘদূত পড়ানো শুরু করলেন।

মেঘদূত পড়ানোর গুণেই কিনা কে জানে, ওই সময়ে এক কাণ্ড ঘটল। সংস্কৃত কলেজের উত্তরদিকে এক গৃহস্থ বাড়ির কর্তা একদিন সটান এসে দেখা করলেন বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সঙ্গে। বললেন, স্যার, বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি, যদি কিছু ব্যবস্থা করেন।

বিদ্যাসাগর বললেন, কী হয়েছে বলুন।

— স্যার, আপনার কলেজের ছাত্রদের জন্য আমার বাড়ির মেয়েদের ছাদে ওঠা বন্ধ হয়ে গেছে।

— সে কি, কেন?

— কী আর বলব, আপনার কলেজের ছাত্ররা সারাক্ষণ হাঁ করে বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে, কখন মেয়েরা ছাদে গেল, কখন ছাদ থেকে নামল। বলুন তো কী লজ্জার কথা!

— হুম্। এ তো ভারী অন্যায়। ঠিক আছে, আপনি যান, আমি দেখছি।

৪

ভদ্রলোক চলে যাবার পর ঘুরতে ঘুরতে টিচার্স রুমে এলেন বিদ্যাসাগর। পণ্ডিত মদনমোহন চেয়ারে বসে আছেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে ডেকে বললেন, উত্তরদিকে দোতলার ক্লাসরুমেই তো তুমি পড়াও। ওদিকের বাড়ির ভদ্রলোক এসেছিলেন। অভিযোগ করে গেলেন ছেলেরা নাকি হাঁ করে ওঁর বাড়ির মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকে। তুমি ছেলেদের বারণ করে দিও ওদিকে যেন না তাকায়।

মদনমোহন হেসে বললেন, দেখো বিদ্যাসাগর, বসন্তকাল পড়েছে। ছেলেরা ক্লাসে মেঘদূত পড়ছে। আর তাদের পড়াচ্ছেন কে? না স্বয়ং মদন। মন চঞ্চল না হয়ে উপায় আছে? হো-হো করে হেসে বিদ্যাসাগর বললেন, সত্যি মদন, তোমায় নিয়ে আর পারা যায় না।

হাসতে হাসতে সেদিন ফিরে গেলেন বটে, কিন্তু বিষয়টা মাথায় রেখে দিলেন। ক'দিন পরে ছুতোর মিস্ত্রি ডেকে ওদিকের জানলার খড়খড়িগুলো স্ক্রু দিয়ে এমনভাবে সেঁটে দিলেন যে ছেলেরা হাজার চেষ্টাতেও আর খুলতে পারেনি।

এমনই ছিলেন প্রশাসক বিদ্যাসাগর। আগে ডিসিপ্লিন। পরে অন্য সবকিছু।

(দুই)

শিক্ষাজগতে বিপুলভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে নিজেকে কীভাবে তৈরি করেছিলেন এই একগুঁয়ে, খর্বাকৃতি ব্রাহ্মণ? সেই কাহিনিও চমকপ্রদ। ১৮৪১ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে দারুণ রেজাল্ট নিয়ে পাশ করে বিদ্যাসাগর উপাধি পেলেন ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পরেই ডাক এল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে। পদটি কলেজের প্রধান পণ্ডিতের। ওই কলেজের ছাত্ররা বেশিরভাগই সিভিলিয়ন। তাঁদের পড়াতে হবে ইংরেজিতে, বোঝাতে হবে ইংরেজিতে। অবসর সময়ে বাড়িতে বসে নিজে নিজেই ইংরেজি শিখতে লাগলেন বিদ্যাসাগর। ক্ষুরধার মস্তিষ্ক তাঁর, অধ্যবসায়ও অসীম। অল্পদিনেই বলা ও লেখায় এতটা পারদর্শী হয়ে উঠলেন যে, বন্ধুবান্ধব-সতীর্থদের কাছে রীতিমতো ঈর্ষার ব্যাপার। এর কিছুকাল পরে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের দুরন্ত অধিকারের কথা শুনে প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছুটিছাটায় তাঁর কাছে সংস্কৃত পড়তে চলে আসতেন। রাজকৃষ্ণবাবু বয়স্ক লোক। তাঁকে পড়াতে গিয়ে বিদ্যাসাগর অনুভব করলেন, তাঁরা নিজেরা যে পদ্ধতিতে

সংস্কৃত শিখেছেন — সে পদ্ধতি এখানে চলবে না। অনর্থক বহু সময় চলে যাবে। ভেবেচিন্তে নতুন এক পদ্ধতি বার করলেন তরুণ বিদ্যাসাগর। পরবর্তীকালে তার ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছিল সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা বা ব্যাকরণ কৌমুদীর মতো বই। যুগযুগ ধরে সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের কাছে যা অবশ্যপাঠ্য হয়ে আছে।

৫

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হওয়ার পর নিছক প্রশাসকের ভূমিকায় নিজেকে বেঁধে রাখতে চাননি বিদ্যাসাগর। প্রবল উৎসাহে নেমে পড়েছেন সংস্কারের কাজে।

প্রথম কাজ, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ এবং পুঁথির রক্ষণাবেক্ষণ ও মুদ্রণ।

দ্বিতীয়, এতদিন ধরে সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ আর বৈদ্য ছাড়া অন্য কোনও বংশের ছাত্রদের প্রবেশাধিকার ছিল না। বিদ্যাসাগর এসে সংকীর্ণ ভেদাভেদ প্রথা তুলে দিয়ে মেধাকেই ভর্তির একমাত্র মাপকাঠি ঘোষণা করলেন। এতে সমালোচনা হয়েছিল বিস্তর। কিন্তু কোনোকিছুই তিনি গায়ে মাখেননি।

তৃতীয়, এর আগে কলেজে ভর্তি হলে সারা বছর কোনও টাকাপয়সা লাগত না ছাত্রদের। উল্টে তারাই কিছু কিছু করে টাকা পেত। বিদ্যাসাগর এসে এই রীতিটাই তুলে দিলেন। ঘোষণা করলেন, এবার থেকে কলেজে পড়তে গেলে টাকা লাগবে। সোজা কথায়, টিউশন ফি দিতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার যে অন্যরকম একটা সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে, পড়ুয়ার অভিভাবকদের সেটা বোঝানো দরকার, ভেবেছিলেন অধ্যক্ষ। বলাবাহুল্য, ঠিকই ভেবেছিলেন।

চতুর্থ, ছাত্রদের সংস্কৃত শিক্ষার ভিত মজবুত করতে, ব্যাকরণের জ্ঞান আরও নিখুঁত করে তুলতে নিজেই নেমে পড়লেন বই লেখায়। তৈরি হল উপক্রমণিকা, ঋজুপাঠের মতো বই।

পঞ্চম, দারুণ গ্রীষ্মের দিনগুলোয় কলেজ ছুটি দিয়ে বাড়িতেই ছেলেদের পড়াশোনা করার রীতি চালু করলেন বিদ্যাসাগর। অহেতুক শরীরকে কষ্ট না দিয়ে বাড়িতে বসে নিজেদের তৈরি করার এই যে রীতি তিনি চালু করেন, আজ দেড়শো বছরের বেশি সময় বাংলার শিক্ষাজগতে তা চালু রয়েছে।

ষষ্ঠ, শিক্ষা মানে যে কূপমণ্ডুকতার গণ্ডি ছেড়ে নিজের মনকে জগতের আরও অনেক কিছুর মধ্যে প্রসারিত করে দেওয়া— সে কথা বোঝাতে সংস্কৃতের পাশাপাশি কলেজে প্রচলন করলেন ইংরেজি শিক্ষার।

কথাগুলো লিখে ফেলা যত সহজ, কার্যক্ষেত্রে কিন্তু মোটেও তত সহজ ছিল না। বিদ্যাসাগরকে এই সময়ে দেখা যাচ্ছে, একদিকে তিনি নির্ভীক প্রশাসক, অন্যদিকে ছাত্রদরদি শিক্ষা-সংস্কারক। ছাত্ররা যে শিখতে এসেছে, জানতে এসেছে, তারা পড়বে কী? ঠিকমতো বই-ই তো নেই। সারাদিন কলেজ করে বাড়ি ফিরে বই লেখা শুরু করলেন বিদ্যাসাগর। ক্লান্তি নেই, বিশ্রামও নেই কোনও। একে একে প্রকাশিত হল বেতাল পঞ্চবিংশতি, বাঙ্গালার ইতিহাস, জীবনচরিত, বোধোদয়, উপক্রমণিকা, শকুন্তলা, সীতার বনবাস। লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল বিদ্যাসাগরের নাম। বাংলার সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতির সেই আলো-আঁধারি সময়ে একার চেষ্টায় গোটা জাতিকে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন বিদ্যাসাগর, এদেশে তো বটেই, বিদেশেও তার তুলনা মেলা ভার।

৬

যেখানে দরকার, গাম্ভীর্যের থমথমে মুখোশটা সেখানে পরে থাকলেও ভিতরে ভিতরে তিনি যে কতখানি রসিক ছিলেন, তার অজস্র কাহিনি ছড়িয়ে আছে বাংলার ঘরে ঘরে। আমরা এখানে শুধু একটা নমুনা রাখছি, যে কাহিনি তুলনায় কম প্রচলিত।

তখন বিধবা বিবাহ নিয়ে সমাজে তোলপাড় চলছে। উঠতে-বসতে বিদ্যাসাগরকে গালাগালি করছে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ। আর আপামর সাধারণের চোখে তিনি ততদিনে দেবতা। এমনই একদিন জরুরি কাজ সেরে বিদ্যাসাগর হাজির হয়েছেন পাণ্ডুয়া স্টেশনে। কিন্তু কপাল মন্দ, একটু আগেই বেরিয়ে গেছে ট্রেন। তখনকার দিনে আজকের মতো এত ঘনঘন ট্রেন পাওয়া যেত না। একটা মিস করলে ঠায় বসে থাকতে হত তিন-চার ঘণ্টা। কী আর করেন, স্টেশন থেকে বেরিয়ে বিদ্যাসাগর এদিক-ওদিক দেখতে লাগলেন যদি কোথাও একটু বসার জায়গা মেলে। স্টেশনের বাইরে এক মুদির দোকান। তিনি এসে বসতে চাইতেই দোকানি খাতির করে টুল এনে দিল। তামাক খান জেনে তাড়াতাড়ি তামাকও সেজে আনল। একটু পরে দোকানে হাজির হলেন মুদির পরিচিত এক ব্রাহ্মণ। মুদি তাকেও বলল, আসেন দাদাঠাকুর, টুলে বসে একটু জিরিয়ে নিন। দুজনে পাশাপাশি বসে তামাক খাচ্ছেন, টুকটাক কথাবার্তা চলছে মুদির সঙ্গে। মুদি হঠাৎ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা দা'ঠাকুর, এই যে শুনছি আজকাল রাঁড়ের (তখনকার দিনে বিধবাকে রাঁড় বলা হতো) বিয়ে হচ্ছে, ব্যাপারখানা কী? ব্রাহ্মণ শুনেই একেবারে গরম। মুখে যা এল তাই বলে গালাগালি করতে লাগলেন। 'ছ্যা ছ্যা, ভদ্দরলোকের মেয়ের দু'বার বিয়ে হয়? এ কী অনাছিষ্টি বলতো দিকিনি।

মুদি বলল, শুনেছি তিনি নাকি মস্ত পণ্ডিত। রাঁড়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন? আরও রেগে গেলেন ব্রাহ্মণ। বললেন, কার কথা বলছ? বিদ্যেসাগর? সে ব্যাটা আবার পণ্ডিত হলো কবে? টাকা খাইয়ে, গোটা কতক ফিরিঙ্গিকে হাত করে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বলে-ক'য়ে বিধবা বিবাহের আইন পাশ করিয়েছে।

সে ব্যাটা যদি পণ্ডিত হয়, তবে মুর্খ কে? মুদি নাছোড়বান্দা। বললে, দা'ঠাকুর, আমি শুনেছি বিদ্যেসাগর নাকি বামুন পণ্ডিতের ছেলে, নিজেও বামুন পণ্ডিত—।

--- কী! বামুন পণ্ডিত? মাথায় টুপি জামা ইজের বুটজুতো পরে মুখে চুরুট গুঁজে ঘাড় বেঁকিয়ে হাঁটে। তাকে বামুন পণ্ডিত বলে নাকি?

বিদ্যাসাগর টুলে বসে এতক্ষণ সবই শুনছিলেন আর মনে মনে হাসছিলেন। এবার তিনি মুখ খুললেন।

—আচ্ছা, আপনি বিদ্যাসাগরকে দেখেছেন?

—দেখিনি? দু'বেলা আমার বাদুড়বাগানের বাসার সুমুখ দিয়ে যাতায়াত করে, তাকে দেখিনি? কলকাতায় ওই ব্যাটাকে কে না দেখেছে। ব্যাটা হিঁদু না ফিরিঙ্গি বোঝা যায় না। ইয়া লম্বা গোঁফ, চোখে চশমা।

৭

এরপর মুদির সেই দা'ঠাকুর যে ভাষায় বলতে শুরু করলেন, তাকে এক কথায় ইতর গালাগালি ছাড়া কিছুই বলা যায় না। সেই তোড় একটু স্তিমিত হলে বিদ্যাসাগর বললেনঞ্চ তা, মহাশয়ের নামটা জানতে পারি? থাকা হয় কোথায়? ব্রাহ্মণ নিজের নাম জানিয়ে জবাব দিলেন, পাণ্ডুয়ারই কাছাকাছি এক গ্রামে তাঁর নিবাস। এবার পাল্টা প্রশ্নঞ্চ তা আপনার নামটা কী?

—আজ্ঞে, অধমের নাম শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

—কী বললেন? বিদ্যাসাগর! দাদাঠাকুর একেবারে থ।

—আর নিবাস?

—আজ্ঞে বাদুড়বাগান।

—আপনি, আপনি কোন বিদ্যেসাগর?

বিদ্যাসাগর হেসে উত্তর দিলেন, যে বিদ্যাসাগর রাঁড়ের বিয়ের ব্যবস্থা করে, আমিই সেই বিদ্যাসাগর। তবে আপনি যে বিদ্যাসাগরের কথা বললেন, বুটজুতো পরে দিনরাত চুরুট খায়, লম্বা গোঁফ, আমি সেই বিদ্যাসাগর নই, সে বোধহয় আর কেউ হবে। আমি তো জীবনে কখনও বুটজুতো পরিনে, চুরুটও খাইনে, আর গোঁফ যে নেই তা তো দেখতেই পাচ্ছেন।

ব্রাহ্মণ কোনমতে সেখান থেকে উঠে একেবারে চোঁ চোঁ দৌড়।

—ও মশাই শুনে যান শুনে যান—ডাকছেন বিদ্যাসাগর।

ডাকটিকিট

আর কী কেউ দাঁড়ায়!

(তিন)

সবাই হয়তো জানে না, বিদ্যাসাগর মশাই একটু তোতলা ছিলেন। নিজের এই ত্রুটি এমনভাবে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন যে, লোকে টেরই পেত না। তোৎলামি সারাতে গেলে আস্তে-আস্তে কথা বলা অভ্যাস করতে হয়। বিদ্যাসাগর জোরে কথা প্রায় বলতেনই না। ফলে বোঝাই যেত না তিনি তোতলা। সমস্যাটা নিয়ে বিদ্যাসাগর এত সচেতন ছিলেন যে, সংস্কৃত কলেজে এতদিন থেকেও পারতপক্ষে ক্লাস নেননি।

৮

পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন, একবার শোনা গেল বিদ্যাসাগর মশাই ক্লাস নেবেন, ছেলেদের উত্তরচরিত আর শকুন্তলা বই দু'টো পড়াবেন। বাস্তবে সে ক্লাস কোনদিনও হয়নি। যদিও সংস্কৃত কলেজের আগে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরি করার সময়ে সিভিলিয়ন ছাত্রদের ক্লাস তাঁকে নিতে হতো। পড়াতে হতো বিদ্যাসুন্দর কাব্য। এছাড়া 'পুরুষ পরীক্ষা' আর 'প্রবোধচন্দ্রিকা' নামে দুটি বই। পুরুষপরীক্ষা পড়াতে গিয়ে বিদ্যাসাগর বোধহয় হাড়ে চটে যেতেন। 'হিতোপদেশ' নামে একটি বাংলা বইও তখন পড়ানো হত, যার রচনারীতি অতি কদর্য।

ছাত্রদের জন্য কয়েকটা ভালো বই লেখার উৎসাহ ওই সময় থেকেই তাঁর মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে। হিন্দিতে 'বেতাল পচ্চীসী' বলে একটা বই বিদ্যাসাগর দেখেছিলেন। লেখকের নাম, লাল্লু লাল। তখনই তাঁর মাথায় আসে ওই বইটি বাংলায় লেখার। বিদ্যাসাগর হিন্দি বইয়ের কঙ্কালটুকু মাত্র নিলেন। এরপর নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে প্রাণসঞ্চার করলেন তাতে। তবে অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, স্বাধীন পুনর্নির্মাণ একে বলা যাবে না, কারণ বিদ্যাসাগর হিন্দি 'বেতাল পচ্চীসী' থেকেই সরাসরি বাংলায় অনুবাদ করেন। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তিঞ্চ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রথম পণ্ডিত হিসেবে চাকরি করার সময়ে একজন হিন্দুস্থানি পণ্ডিত রেখে তিনি হিন্দি শিখেছিলেন। সেই ভাষাটি তাঁর কতটা আয়ত্তে এসেছে, বেতালের অনুবাদের মধ্যে দিয়ে সেটাই দেখতে চেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর।

এটা সত্যি, বেতাল পঞ্চবিংশতির প্রথম সংস্করণের বাংলায় যথেষ্ট জড়তা ছিল। বিদ্যাসাগর নিজেও তা বিলক্ষণ জানতেন। তাই দ্বিতীয় সংস্করণ থেকেই ধাপে ধাপে সেই জটিল গদ্য সাধারণ পাঠকের বোঝার মতো সহজ করে তুলতে থাকেন। অনেকখানি সফলও হন। এর চেয়েও বড় কথা, সেই প্রথম বাংলা গদ্যে—যাকে বলে সাহিত্যের সাধুভাষা—তার পরিচয় পাওয়া গেল। এ ভাষা সেকালের খটোমটো সংস্কৃত নয়, হুতোমি বা আলালি ভাষা নয়, এই ভাষায় এমন এক প্রসন্ন রস ছিল যে আপামর সাহিত্যপিপাসু বাঙ্গালি বেতাল পঞ্চবিংশতি পড়ে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। যেমন বেতাল পঞ্চবিংশতির উনিশতম উপাখ্যানঃ

''তথায় এক অতি মনোহর সরোবর ছিল। তিনি (রাজা রূপদত্ত) তাহার তীরে গিয়া দেখিলেন, কমল সকল প্রফুল্ল হইয়া আছে ; মধুকরেরা মধুপানে মত্ত হইয়া গুণগুণ রবে গান করিতেছে; হংস, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি জলবিহঙ্গগণ তীরে ও নীরে বিহার করিতেছে; চারিদিকে কিশলয়ে ও কুসুমে সুশোভিত নানাবিধ পাদপসমূহ বসন্তলক্ষ্মীর সৌভাগ্য বিস্তার করিতেছে।.... রাজা নিতান্ত পরিশ্রান্ত ছিলেন; বৃক্ষমূলে অশ্ববন্ধন করিয়া তথায় উপবেশনপূর্বক শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন।''

৯

১৮৫৬ সাল, অর্থাৎ মহা বিদ্রোহের আগের বছর বিদ্যাসাগরের জীবনের সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। দিনের পর দিন তাঁর খ্যাতি আর প্রতিপত্তি তখন বেড়ে উঠছিল। শিক্ষাজগতের সাহেব কর্তারা বিদ্যাসাগরের পরামর্শ না নিয়ে এক পা-ও চলতে চাইতেন না। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ তো ছিলই। এর ওপর সাহেবরা তাঁর কাঁধে চাপালেন হুগলি, নদিয়া, বর্ধমান আর মেদিনীপুরের ইনস্পেক্টর পদ। পরিশ্রম চতুর্গুণ বাড়ল। কিন্তু কর্মযোগী বিদ্যাসাগর কোনোকিছুতেই বিচলিত হবার পাত্র নন। একদিকে বেথুন সাহেবের পরামর্শে চলছে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের আন্দোলন। অন্যদিকে বিধবা বিবাহ যে হিন্দুশাস্ত্র বিরোধী নয়, তা প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লেগেছেন তিনি। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ নিয়ে লেখা বইটি যখন বেরল, বাংলার রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে আগুন জ্বলে উঠল। ভ্রূক্ষেপ নেই বিদ্যাসাগরের। নিজের চেষ্টায় বিধবাদের বিয়ের আয়োজন করতে লাগলেন একের পর এক। পাশাপাশি ব্রিটিশ রাজপুরুষদের কাছে দরবার করে বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে আইন আনার চেষ্টা শুরু করলেন। কার সাধ্য তাঁকে থামায়?

কিন্তু দুর্ভাগ্য, চার জেলার ইন্সপেক্টর হিসাবে একের পর এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়ার কিছুদিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের গোলমাল লেগে গেল। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর পদে তখন এসেছেন গর্ডন ইয়ং নামে এক সাহেব। মেয়েদের স্কুল গড়ার জন্য টাকা দিতে তিনি একেবারেই রাজি ছিলেন না। তাঁর ধারণা হয়েছিল, এ সব সরকারি অর্থের অকারণ অপব্যয়। বিদ্যাসাগর তাঁকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু সাহেব কোনও কথাতেই কান দিচ্ছিলেন না। বিব্রত বিদ্যাসাগর গেলেন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে। তাঁর হস্তক্ষেপে সে যাত্রা মুখরক্ষা হলো বটে, কিন্তু ডিরেক্টর বিষয়টাকে মোটেও ভালোভাবে নিলেন না। কথায় কথায় বিবাদ শুরু হলো। ডিরেক্টর সুযোগ পেলেই তাঁর প্রস্তাব বা সুপারিশ আটকে দিতে লাগলেন। ডিরেক্টরকে ডিঙিয়ে কতবার ওপরমহলে যাবেন বিদ্যাসাগর? সকলেই যে সাহেব! আর তিনি পরাধীন দেশের কৃষ্ণবর্ণ এক নাগরিক। এইভাবে বছর দুয়েক চলার পর বাধ্য হয়ে চাকরি ছাড়লেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। শুরু করলেন প্রকাশনা আর মুদ্রণের ব্যবসা। সেখানেও পিছিয়ে ছিলেন না। শোনা যায়, মৃত্যুর আগে ব্যবসায়ী বিদ্যাসাগরের বাৎসরিক রোজগার ছিল প্রায় তিরিশ হাজার টাকা। আজকের দিনে যার মূল্য অনেক।

সেকালের সাহেব-রাজপুরুষ মহলে কেন এত খাতির ছিল বিদ্যাসাগরের? জবাব একটাই। সাহেবরা বুঝতে দেরি করেননি ধুতি-চাদর পরা ছোটখাট চেহারার পণ্ডিতটি নিজের জন্য কিছু চাইতে আসেন না। আসেন মানুষের কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে। বিভিন্ন সমস্যায় বিদ্যাসাগরের পরামর্শ নেওয়ার জন্য সাহেবরাই তাঁকে ডেকে পাঠাতেন। এদিকে দিশি রাজা-মহারাজার দল চোগা-চাপকান পরে মাথায় পাগড়ি চড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন ঘরের বাইরে। তাঁদের ডাক আর আসত না।

১০

একদিন হ্যালিডে সাহেবকে সরাসরি প্রশ্নটা করেছিলেন বিদ্যাসাগর। আচ্ছা, আপনার ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখলাম, শহরের তাবড় তাবড় ধনী লোক বাইরে বসে আছেন। ওঁরা তো আমারই দেশবাসী। ওঁদের এত কষ্ট দেন কেন?

হ্যালিডে বাঁকা হেসে জবাব দিলেনঃ বলুন তো, ওরাই বা আমার কাছে কেন আসে? আমি তো ওদের ডেকে পাঠাই না। শুনে রাখুন, ওরা পাঁচদিন দেখা না পেলে ষষ্ঠদিন আবার আসবে। কারণ ওদের অনেক কিছু পাওয়ার আছে। কিন্তু আপনাকে পাঁচ মিনিট বসিয়ে রাখলে যদি একবার ফিরে যান, তাহলে তো ডাকলেও আর আসবেন না। এটাই তফাত।

সাহেব মহলে এই যে এত খাতির, তার সুযোগ কি কখনও তিনি নিতেন না? কিছু তো নিতেনই। অন্তত ইতিহাস সে কথাই বলছে। কারও কারও মতে, ক্ষমতার অলিন্দে এমন অবাধ প্রবেশাধিকার তো একদিনে হয়নি। স্বাভাবিক কারণেই বিদ্যাসাগর চাইতেন না তাঁকে টপকে কেউ সরাসরি সেখানে পৌঁছে যাক। এ

বোধহয় গুণী প্রভাবশালী মানুষদের একটা সাধারণ দুর্বলতা। বিদ্যাসাগরও ব্যতিক্রম ছিলেন না। শোনা যায়, সমকালীনদের মাথায় গার্জেনের মতো থাকতে চাইতেন বিদ্যাসাগর। কখনও কাউকে অল্প কিছু প্রশংসা করতেন। কাউকে আবার ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতেন। ভালই জানতেন, কেউ যদি কিছু লিখে থাকেন, বইটই বার করে থাকেন—বিদ্যাসাগরের সুপারিশ ছাড়া সে বই স্কুল-কলেজ বা শিক্ষিত সমাজে চালু হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।

যেমন শ্যামাচরণ সরকার। ইংরেজি সাহিত্যে দুর্ধর্ষ পণ্ডিত, লাতিন-গ্রিকও জানতেন ভালো মতন। সংস্কৃত কলেজে ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। শ্যামাচরণবাবু বাংলা ভাষায় একটি চমৎকার ব্যাকরণ বই লিখেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সে বই বিদ্যাসাগরের সমর্থন পেল না। দূর দূর, এসব কী লিখেছে শ্যামাচরণ— হাত উল্টে বলে দিলেন সংস্কৃত কলেজের মহা প্রভাবশালী প্রিন্সিপাল। এবং সে বইয়ের ভবিষ্যতের ওখানেই ইতি। বিদ্যাসাগরের একনিষ্ঠ ভক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যেরও আক্ষেপ, অত সুন্দর ব্যাকরণ লিখেছিলেন শ্যামাচরণবাবু। শুধু বিদ্যাসাগর মশাইয়ের আনুকূল্য না পাওয়ায় 'বাংলা সাহিত্য চিরদিনের জন্য তাঁহাকে হারাইল।'

রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একটু অন্যরকম পদ্ধতিতে এনসাইক্লোপিডিয়া রচনা করেছিলেন। বাঁদিকের পৃষ্ঠায় কোনও ইংরেজি বই বা তার অংশবিশেষ। আর ডানদিকে কৃষ্ণমোহনের বাংলা অনুবাদ। কী কারণে জানা নেই বিদ্যাসাগর কৃষ্ণমোহনকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। প্রসঙ্গ উঠলেই একে-ওকে বলতেন, লোকটার রকম দেখেছ? টুলো পণ্ডিতের মতো কথায় কথায় ভট্টির শ্লোক quote করে। ব্যস, এই মন্তব্যের পর কৃষ্ণমোহনের সাধের এনসাইক্লোপিডিয়ার দফারফা।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি

১১

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পর্কে বিদ্যাসাগর ব্যঙ্গ করে বলতেন, বুঝলে হে, লোকটা ইংরেজিতে ধনুর্ধর পণ্ডিত। এদিকে সাহেবদের কাছে বলে বেড়ায়ঃ আজ্ঞে ইংরেজি তো তেমন জানি না। যেটুকু জানি, সেটা সংস্কৃত। শুনে-টুনে সাহেবরা ভাবে—বাপরে! ইংরেজি এত ভালো জেনেও বলে কি না তেমন জানি না। না জানি সংস্কৃতে কিরকম পণ্ডিত! নাম না করে রাজেন্দ্রলাল সম্পর্কে এক সাহেবকে তিনি বলে এসেছিলেনঃ তোমরা না যেমন বুদ্ধিমান, তেমনই নির্বোধ। নইলে দেশের এত অকর্মণ্য লোকজন তোমাদের ঘাড়ে কাঁঠাল ভেঙে পশার জমায় কী করে?

বলাবাহুল্য, 'লেখক' রাজেন্দ্রলাল মিত্র এরপর শত চেষ্টাতেও আর দাঁড়াতে পারেননি।

(চার)

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালিদের যদি একটা তালিকা করা যায়, বিদ্যাসাগর কি সে তালিকায় আসবেন? নীরদ চৌধুরী এক কথায় বলে দিচ্ছেন—কিছুতেই না। অথচ বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব নিয়ে তাঁর কোনও সংশয় ছিল না। বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে তিনি যে শ্রেষ্ঠ, এমন দাবিও নীরদবাবু মেনে নিয়েছেন। তাহলে তাঁর আপত্তিটা কোথায়? 'দি ইনটেলেকচুয়াল ইন ইন্ডিয়ার' লেখক নীরদ সি চৌধুরী যুক্তি সাজিয়েছেন এইরকমঃ ১। বিদ্যাসাগর কোনোদিন মহাকবি হননি। ২। তিনি কখনও উপন্যাস লেখেননি। ৩। কোনোদিন ধর্মপ্রচার করেননি। ৪। দেশের জন্য কখনও আত্মোৎসর্গ করেননি।

নীরদবাবুর যুক্তিতে সারবত্তা আছে, অস্বীকার করা যায় না। সে সব মেনেও বলা যায়, অসামান্য কিছু বিশিষ্টতা বিদ্যাসাগরের অবশ্যই ছিল যার জোরে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জন্মানো একজন বাঙ্গালি আজ দু'শো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও প্রাসঙ্গিক। সাহিত্য-শিল্পের সেই আলো-আঁধারি যুগে নতুন ধরনের বাংলা গদ্যভাষার সূচনা করেছিলেন বিদ্যাসাগর। যদিও এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধি তাঁর নয়, বরং বঙ্কিমচন্দ্রের। শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের স্মরণীয় অবদান, ছোটদের বর্ণমালা শেখানোর বইগুলো। বাংলা সাহিত্যসৃষ্টি বলতে হিসেব মতো দাঁড়াবে তিনটি বই—বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা আর সীতার বনবাস। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এদের কোনোটিই মৌলিক সাহিত্যসৃষ্টি নয়, অনুবাদমাত্র। ব্যাকরণ শেখানোর জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা নিঃসন্দেহে একটি চমৎকার বই। যুগে যুগে এই বইয়ের হাত ধরেই ছাত্র-ছাত্রীরা সংস্কৃত ভাষা ও

সাহিত্যের অন্দরমহলে পৌঁছে গেছেন। কিন্তু এই উপক্রমণিকাও কোনোভাবেই মৌলিক রচনা নয়—যা তাঁকে হাত ধরে মহাকালের সিংদরোজা পার করে দেবে।

তাহলে বাকি কী রইল, যার জোরে তিনি দেশবাসীর মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো স্থায়ী হয়ে থেকে গেলেন?

১২

জবাব সম্ভবত একটাই। বিদ্যাসাগর এমন এক বিরলতম বাঙ্গালি, যিনি ধুতি-চাদর গায়ে জীবন কাটিয়ে দিলেও যাঁকে আদৌ বাঙ্গালি বলা যায় কি না সে প্রশ্নটি এখনও অমীমাংসিত অবস্থায় পড়ে আছে। তাঁর চরিত্রের যেগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য, তার একটা উপাদানও বাঙ্গালি জাতির চরিত্রে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এতকাল পরেও নয়। ইউরোপীয় যুগপুরুষদের যে প্রধান তিনটি গুণ—আদর্শবাদ, কর্তব্যবোধ আর নীতিনিষ্ঠা— কীভাবে যেন এর প্রত্যেকটিই বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো ছিল। সঙ্গে ছিল অসামান্য মানসিক দৃঢ়তা। অর্থে, ভয়ে, প্রলোভনে কোনও কাজ থেকে পিছিয়ে আসা তাঁর ধাতুতেই ছিল না। বিধবা বিবাহ প্রচলনের সময়ে হিন্দুসমাজ থেকে যখন তাঁকে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হচ্ছে, তখনও নিজের বিশ্বাস আর কর্তব্যবোধ থেকে এক কদম পিছিয়ে আসেননি বিদ্যাসাগর। এমন চরিত্রবল বাঙালিদের মধ্যে কোথায়?

অনবরত ধাক্কা খেতে খেতে জীবনের শেষবেলায় মানুষ সম্পর্কেই তিনি খানিকটা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। মুখের ওপর যা-তা বলে দিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা হয়েছিল, টাকার লোভে ওরা না পারে এমন কাজ নেই। আর সেকালের ইংরেজি শিক্ষিত বাঙ্গালি? এরা আরও ঘৃণ্য, চতুর, ডেঁপো এবং অসার। এদের সংস্পর্শে থাকার চেয়ে বরং 'অসভ্য' সাঁওতাল সমাজে দিন কাটানো ভালো। বৃদ্ধবয়সে সাঁওতাল পরগনার কর্মটাঁড়ে বাসা নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। কলকাতায় প্রকাশনার ব্যবসা চালাতেন। বৌবাজারে বন্ধু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে যাতায়াত করতেন। ফাঁকে ফাঁকে যখনই সময় পেতেন, চলে আসতেন কর্মটাঁড়ে, সাঁওতালদের সান্নিধ্যে। তাদের সঙ্গে গল্প করতেন, মাদল শুনতেন। আশ্চর্য এক প্রশান্তিতে ভরে উঠত তিতিবিরক্ত মন। শেষপর্যন্ত কর্মটাঁড়ই হয়ে উঠল বিদ্যাসাগরের শেষবেলাকার প্রাণের আরাম, আত্মার শান্তি।।

ঋণ স্বীকার কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, বিপিনবিহারী গুপ্ত, প্রসাদ সেনগুপ্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ইন্দ্রমিত্র, বিদ্যাসাগর রচনাবলী, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, শ্যামাপ্রসাদ বসু

With Best Compliments from-

ANIL AHUJA

Ahujas Web Pvt. Ltd.

6/47, W. E. A, Karol Bag
New Delhi- 110005

হরিহরের পথ ও পাঁচালী

অচিন্ত্য বিশ্বাস

ইংরেজি ও ফরাসি অনুবাদে 'পথের পাঁচালী' অসম্পূর্ণ। 'অক্রূর সংবাদ' অংশটি পরিত্যক্ত হয়েছে।[১] রুশ ও জার্মান ভাষায় অনুবাদ হয়েছে কেবল 'আম আঁটির ভেঁপু' অংশ। 'বল্লালী বালাই' নেই— নেই 'অক্রূর সংবাদ'।[২] মার্কিন ও ইউরোপীয় মন 'পথের পাঁচালী'কে ঠিকমতো বুঝেছে কিনা ভাবা দরকার। আর্নেস্ট বেন্ডার লিখেছেন, এই উপন্যাস শিশুর চোখে দেখা ভারতীয় পল্লীজীবন।[৩] আমেরিকার 'চয়েস' পত্রিকা এখানে পেয়েছে ভারতীয় পল্লী জীবনের নিষ্ঠুর যন্ত্রণার নিরাবরণ বিবরণ।[৪] বস্তুত পশ্চিম পৃথিবী 'পথের পাঁচালী'র ভিতরের কথাটি বুঝতে পারেননি। পারার কথাও নয়। একই কথা আধুনিক মুদ্রিত মাধ্যমে প্রচলিত বাংলা সাহিত্যের দিকপাল গবেষক পণ্ডিতদের সম্পর্কেও। তারা জানেন না, দেশের প্রাচীন উপনিবেশপূর্ণ ভারতীয় জনসত্তার যাত্রাপথ, জানেন না, আমাদের সংস্কৃতির হাতে লেখা পথের পাঁচালী। 'ইউনেস্কো' না জানতে পারেন, কিন্তু লোকনাথ ভট্টাচার্যের সহধর্মিণী ফ্রান্স ভট্টাচার্য জানলেন না। জানলেন না 'সাহিত্য আকাদেমি'-র বিশেষজ্ঞরাও!

অবশ্য, এই স্ববিরোধ ও বিভ্রান্তির ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১২.৯.১৮৯৪ - ১.৯.১৯৫০)-ও কিছুটা দায়ী। 'স্মৃতির রেখা'য় যখন তিনি লেখেন, 'নভেলে... শৈশব কালের স্মৃতিরই পুনরাবৃত্তি করেছি মাত্র' কিংবা ১০.৯.১৯৪০-এ লেখা পত্রে স্ত্রী রমাদেবীকে লেখেন, ভাগলপুরের 'বড়বাসা'য় থাকাকালীন জন্মগ্রাম ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে 'মন খারাপ' থেকেই 'পথের পাঁচালী'র সৃষ্টি— তখন আর্নেস্ট বেন্ডারের বা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীকে উত্তেজিত না করবে কেন! 'পথের পাঁচালী' উপহার দেবার সময় বিভূতিভূষণ স্বাক্ষর করেন 'অপু'। উপহারের প্রাপক ছিলেন সজনীকান্ত দাস (১৫.৮.১৯০০ - ১১.২.১৯৬২)। আবার 'তৃণাঙ্কুরে' বিভূতিভূষণই লিখেছেন তাঁর উপন্যাসটি নিছক আত্মজৈবনিক নয়— 'জীবনের সংযোগ' এখানে 'ভাসা ভাসা ধরনে'র। বস্তুত 'পথের পাঁচালী'-তেও আত্মজৈবনিক উপাদান কম নেই। আমরা সেই ক্ষেত্রে এই প্রবন্ধে বিস্তারে যাচ্ছি না। আমাদের লক্ষ্য পথ ও পাঁচালী।

পথ বলতে দেশ কাল পাত্রের মাত্রা। পথ দেশে দেশে ছড়িয়ে থাকে। কাল প্রবাহ খুবই জটিল। কিছুদিন আগে 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় (বৈশাখ ১৪২৫) একটি প্রবন্ধে ('নিমেষ ও মহাকাল') মুসলিম ও ব্রিটিশ শাসনপূর্ব ভারতীয় সময়-চেতনা নিয়ে বিস্তৃত তথ্য সমাবেশ করেছি। বিভূতিভূষণ এই কালচেতনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁর 'দেবযান' বা 'আরণ্যক' উপন্যাসে এর দুটি প্রসঙ্গ দেখা গেছে— 'ইছামতী' উপন্যাসে আছে এর আধ্যাত্মিক ভাষ্য। সাহিত্যকৃতিতে কালের মাত্রা বিচার মিখাইল মিখাইলোভিচ বাখতিন (১৬.১১.১৮৯৫ - ৭.৬.১৯৭৫) এবং নর্থপ ফ্রাই (১৯১২-১৯৯১) গভীরভাবে বিচার করেছেন। বাখতিন রুশী তাত্ত্বিক। ফ্রাই কানাডার অধ্যাপক। বাখতিন দেখিয়েছেন, টলেমির কাল চেতনা (Ptolemic) ছিল মধ্যযুগীয়— অন্যপক্ষে গ্যালিলিওর দৃষ্টিতে (to the Galilean view) হলো আধুনিকতার দিকে উন্মুখ।[৫] টলেমির ভাবনা ছিল পৃথিবী-কেন্দ্রিক। গ্যালিলিওর সময় ভাবনা সূর্যকেন্দ্রিক। বাখতিন দেখিয়েছেন, এই দুই ভাবনার মধ্য দিয়ে বিশ্ব-দৃষ্টির মৌলিক প্রভেদ ঘটে যায়। এভাবে গড়ে উঠেছে তাঁর 'কালক্রম চিহ্ন (Chronotope) -এর তত্ত্ব। তাঁর ভাষা থেকে উদ্ধৃত করি— 'Without such temporal spatial expression, even abstract thought is impossible. Consequently, every entry into sphere of meaning is accomplished only. Through the gates of chronotope'[৬]। এভাবে চলার পথ আর কাল মিশে যায়।

নর্থপ ফ্রাই ১৯৫৭ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Anatomy of Criticism' -এ সময়কে ঋতুচক্র, দিন-রাত্রির সাময়িক চক্র; বর্ষচক্রের সঙ্গে মিশিয়ে নায়কের নায়িকার মনস্তত্ত্ব আর সাহিত্য সংরূপের সূক্ষ্ম বিচার করেছেন।[৭] এভাবে ফ্রাই দেখাতে থাকেন 1. 'yearly cycle of the season'; 2. 'the daily cycle of the sun'; 3. 'the nightly Cycle of dreaming and awakening'[৮]।

উপন্যাসে স্থান কালের সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত থাকে মুখ্য চরিত্রের (protagonist) যাত্রা। এভাবে দেখলে বলতেই হয় 'পথের পাঁচালী'কে আমরা এতদিন ধরে অপূর্ব রায় বা শ্রীমান অপুর যাত্রা বলে ধরে নিয়ে সামান্য ভুলই করেছি। পাশ্চাত্য সমালোচকরা একে দারিদ্র-লাঞ্ছিত পরিবারের উৎসন্ন হবার কাহিনি ভেবেছেন। কোনো কোনো অনুবাদক 'ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে সেকালের অবসান হইয়া গেল'[৯] —এই বাক্য থেকে ধরে নিলেন এপর্যন্ত অপুর ভূমিকা তো নগণ্য। অতএব এটুকু বাদ দেওয়া যাক। তাঁরা ধরে নিলেন, 'বল্লালী বালাই' বোঝানোর দরকার নেই— ও হলো ভারতীয় সমাজের একটি অননুবাদ্য অংশ। প্রত্যেক জাতি ও সমাজের কিছু চলন থাকে। তাতে মানুষ পীড়িত হয়— সেই পীড়ার মধ্যে মনুষ্যত্বের পরাভব, সম্পর্কের টানাপোড়েন থাকে। আমাদের সমাজে কৌলীন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, সতীদাহপ্রথা (কিংবা ছিপছিপে বালিকা বধূটির সংসারহীন, একলা পরিতাজ্য হয়ে নিত্য পুড়ে মরা) ছিল। তা আড়াল করলে এই পথটি কি স্পষ্ট হয়? যে পথ চলে যায়, 'ঠাঙাড়ে বীরু রায়ের বটতলায়' থামে না— 'ধল চিতার খেয়াঘাটের সীমানায়' বাঁক নেয়— থামে না। 'দিন রাত্রি পার হয়ে, জন্ম মরণ পার হয়ে, মাস, বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে'— এই পথ চলে যায়। চলেই যায়।

পদাতিক অপু। পথচারী তার পিতা হরিহরও। অপু দু'পাশ দেখে। হঠাৎ নজরে পড়ে পথপ্রান্তে কী যেন চলে গেল। হরিহরের মনে হয় যাত্রাশেষে কোথাও পৌঁছতে হবে। হঠাৎ উঁচু উঁচু কানের কী যেন চলে গেল, ফাঁকা মাঠে টেলিগ্রাফের খুঁটিতে কান দিয়ে দূর দেশের রহস্য রোমাঞ্চে তার আগ্রহ জন্মালে চলে না। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে এক বিচিত্র দ্বিরালাপ লক্ষিত হয়। কিছুতেই যেন স্থির হয় না উপন্যাসের আসল মুখ্য চরিত্র (protagonist) কে? বাংলা ভাষার নোট মুখস্থ করা ছাত্রছাত্রীরা বলবে— এটা অবান্তর প্রশ্ন। মুখ্য চরিত্র অবশ্যই অপু। তার বড় হওয়াই তো উপন্যাসের মর্মবস্তু। আমরা ভিন্ন মত পোষণ করছি। দুই খণ্ড 'অপরাজিত' আর চলচিত্রায়িত 'পথের পাঁচালী', 'অপুর সংসার' দেখে আমাদের মনে এই বিচিত্র ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে বটে। আমাদের মনে হয়েছে, অপুই এই কাহিনির মুখ্য। আমাদের বিহ্বল করে বিভূতিভূষণের বর্ণনার অপরূপতা। দেখাই :

১. 'অনেক দূরের কথায় তাহার শিশুমনে একটা বিস্ময় মাখানো আনন্দের ভাবের সৃষ্টি করিত।'[১১]

২. 'জীবন-পথের যে দিক মানুষের চোখের জলে, দীনতায়, মৃত্যুতে আশাহত, ব্যর্থতায় বেদনায় করুণ— পুরোনো বইখানার ছেঁড়া পাতায় ভরপুর গন্ধে, মায়ের মুখের মিষ্টি সুরে, রৌদ্রভরা দুপুরের মায়া-অঙ্গুলি নির্দেশে, তাহার শিশু দৃষ্টি অস্পষ্টভাবে সে পথের সন্ধান পাইত।'[১২]

অপুর এই বহুদূরের সংবাদ শুধু কল্পনা থেকে আসেনি। এর ভিত্তি আমাদের কথনরীতি, আর পুঁথিপত্রের মাধ্যমে যা কতকাংশে মৌখিক। দ্বিতীয় উল্লেখটিতে স্পষ্ট যে সর্বজয়া মুখে পান পুরে জীর্ণ মহাভারত শোনাচ্ছিল— অপু তো এভাবেই পাচ্ছিল তার দূর একটি আশ্চর্য উৎস পথের সন্ধান। উপন্যাস জুড়ে এই উৎসপথের ভালো মন্দ রহস্য রোমাঞ্চের রাজপথ আর অভিসন্ধির পরিচয়। আমরা

ভালো করে খেয়াল করলে ইন্দির ঠাকরুণের ছড়ায়, দুর্গার ব্রতগীতে, সর্বজয়ার মহাভারতপাঠে, গ্রাম্য যাত্রাগানের অদ্ভুত সংলাপ ও টিনের তরবারির বিষম যুদ্ধে এর পরিচয় পাবো। অপু যে মহাবীর কর্ণের ছবি দেখতে পায় সূর্যাস্তের দিকচক্রবালে তার প্রত্ন প্রতিমা ব্যাখ্যায় বিভূতিভূষণের সিদ্ধির চমৎকারটুকু দেখলে একে সবটা দেখা হয় কী? দেখাই,

বিভূতিভূষণ

বাখতিন

'কর্ণ যেন ওই অশ্বত্থ গাছটার ওপারে আকাশের তলে, অনেক দূরে কোথায় এখনও মাটি হইতে রথের চাকা দুই হাতে প্রাণপণে টানিয়া তুলিতেছে— রোজই তোলে— রোজই তোলে— মহাবীর, কিন্তু চিরদিনের কৃপার পাত্র কর্ণ।'[১৩]

সূর্যপুত্র কর্ণ, সূর্যাস্তের সঙ্গে তার এই আশ্চর্য আবর্তন আপতন মহাকবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসই কি নির্দিষ্ট করে দেননি? এই ধারাবাহিকতাই ভারতবর্ষের জীবনপথের পাঁচালী।

অপুর সৃজনশীল কল্পনা হরিহরের উত্তরাধিকার। হরিহরের বাক্সটিতে অপু কিছু আশ্চর্য বস্তুর ইশারা পেয়েছিল। আধুনিক উত্তর উপনিবেশিক পরিস্থিতি দিয়ে একে বুঝতে চাওয়া বিভ্রান্তিকর। হরিহরের বিদ্যাগ্রহ, পাণ্ডিত্য, কল্পনাচারিতা, শিল্পবোধ— সবই নিতান্ত 'দেশী'। তাকে বুঝতে না পারলে পথের পাঁচালী নিছক এক শিশু মনের আশ্চর্য ভেবে রোমাঞ্চ হতে পারে, কিন্তু পথের পাঁচালী তো হরিহরেরও জীবনের পাঁচালী— তা না বুঝলে উপন্যাসের পাঠ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পশ্চিমী অনুবাদকরা 'অক্রুর সংবাদ'কে পরিশিষ্ট বা বর্জনীয় বিবেচনা করেছেন— কিন্তু ওখানেই আছে ইছামতী থেকে বারাণসীর গঙ্গা পর্যন্ত এক অভিনব পথের ইঙ্গিত। আঞ্চলিক কেমন করে মহাভারতীয় জাতীয়, আধ্যাত্মিক আর বৈশ্বিক হচ্ছে, আর ঠিক কোথায় নিমেষ ও ক্ষণকাল হয়ে উঠছে মহাকাল বা চিরকাল — তা বোঝার সঙ্গে আমাদের বুঝে নিতে হবে দুই প্রজন্মের দ্বান্দ্বিকতার পরিণতি।

পিতা খেয়ালী মানুষ, বিষয়বুদ্ধি নেই। তবে তার পুঁজিটি নেহাৎ কম ছিল না। অপু তা সবার আড়ালে পড়ত। পেয়েছিল 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ', সেই বই খুলতেই 'কাগজ-কাটা পোকা' বেরিয়ে পালাল। 'অপু বইখানা নাকের কাছে লইয়া গিয়া ঘ্রাণ লইল, কেমন পুরনো গন্ধ।' শুধু কী তাই— 'গন্ধটায় কেবলই বাবার কথা মনে করাইয়া দেয়। যখনই এ গন্ধ সে পায় তখনই কী জানি কেন তাহার বাবার কথা মনে পড়ে।'[১৪] সেখানে ছিল শকুনির ডিম আর পারদের মাধ্যমে শূন্যমার্গে ভ্রমণের বিচিত্র ভেল্কিবাজির সংবাদ। শেষ অবধি দিদি দুর্গার ভাষায় 'হাঁ-করা ছেলে' অপুর কাছ থেকে রাখাল এসে চার পয়সায় বিক্রি করে গেল শকুনের ডিম! সর্বজয়া বুঝল, 'রাখাল ছোঁড়াটা, বদমায়েশের ধাড়ি'। আর অপু 'ছেলেটা যে কী বোকা' তা বলে বোঝানো যাবে না। সর্বজয়ার জানার কথা নয়— 'সকলেই তো কিছু সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ পড়ে নাই, বা সকলেই কিছু পারদের গুণও জানে না।'[১৫]

গ্রামের একলা বৃদ্ধ নরোত্তম দাস, তাঁর কাছে 'প্রেম ভক্তিচন্দ্রিকা'-র পদাবলী আর পুরাণ সাহিত্য আকণ্ঠ পান করত অপু। নরোত্তমের ছিল শিল্পবোধ। এক শিষ্যের বাঁধা পদ তার ভালো লাগত না। তার আদর্শ 'বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস'। রসিক বালক অপুকে তার 'গৌর' মনে হত। বলেছিল, 'আমি মরবার সময়ে এই বইখানা তোমাকে দিয়ে যাবো দাদু, তোমার হাতে বইয়ের অপমান হবে না।'[১৬]

হরিহরের কাছে অপু চেয়েছিল পদ্মাপুরাণের একটি খণ্ড। যুগীপাড়া থেকে সেই বইখানা 'বটতলায় ছাপা', পড়ার জন্য এনেছিল হরিহর। সেটি পড়ত অপু। 'কুচুনী পাতায় শিব ঠাকুরের মাছ ধরিতে যাওয়ার কথাটা পড়িয়া তাহার ভারী আমোদ।'[১৭] নরোত্তম দাস এই বটতলার পদ্মাপুরাণ— এক অনিন্দ্য শিল্পপথের সন্ধান দেয় অপুর শিশু মনের কল্পনাচারিতাকে। পিতার টিনের বাক্সে অপু খুঁজে পায়— 'নিত্য কর্মপদ্ধতি', 'প্রাকৃতিক ভূগোল', 'শুভঙ্করী', আর 'পাতা-ছেঁড়া বীরাঙ্গনা'। আর আছে 'মায়ের সেই মহাভারত।'[১৮] হরিহরের পথ— উদাসীন জ্ঞান সন্ধানীর শুধু নয়, তার ছিল সৃজনশীল ক্ষমতা, মৌখিকভাবে চলে আসা যা কিছু দেশী—সবই তার আগ্রহ অনুধ্যানের বিষয় ছিল। খোড়ে নদীর ধারে কাঠগোলার অধিকারী তার গলায় 'শ্যামা বিষয়ক' গান শুনে খুশি হয়ে এক টাকা প্রণামী দিয়েছিল।[১৯]। এক ভাগ্য বিড়ম্বিত বিদ্যানুরাগী শিল্পী মনের হরিহরের এই জ্ঞান-পথের সঙ্গে সংযোগ না থাকলে অপু অপু হতো না।

বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটের ষষ্ঠী মন্দিরের নিচে 'কাশী খণ্ডের' পুঁথি নিয়ে বসার পিছনে সর্বজয়ার উৎসাহ পরামর্শও ছিল। এমনিতে 'কয়েক স্থানে হাঁটাহাঁটি' করে 'কয়েকটি মন্দিরে নিত্য পুরাণ পাঠের' কাজ জোগাড় হলো। সর্বজয়া বলল, দশাশ্বমেধ ঘাটে রোজ বিকেলে পুঁথি নিয়ে বোসো না কেন? কত ফিকিরে লোক পয়সা আনে, তোমার কেবল বসে বসে পরামর্শ আঁটা'।[২০] সর্বজয়ার কি হরিহরের মতো মন আছে! হরিহরের আজন্ম স্বপ্ন ছিল, 'ঝাড় লণ্ঠনের আলো ঝোলানো বড় আসরে সে দেখিতে পায়, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে' তার 'ছড়া, গান, শ্যামা সংগীত, পদ, রাত্রির পর রাত্রি' ধরে 'গাওনা'

হচ্ছে— 'কত দূর দূরান্তর' থেকে মাঠঘাট ভেঙ্গে লোক খাবারের পুঁটুলি বেঁধে এনে বসে থাকবে শোনার আগ্রহে।' 'দলের অধিকারী' তার বাড়িতে এসে পালা চেয়ে নিয়ে যাবে। লোক জানতে চাইছে— বাঃ! ভারী চমৎকার তো! কার বাঁধা ছড়া?— 'কবির গুরু ঠাকুর হরু'— হরু ঠাকুরের? — না। নিশ্চিন্দপুরের হরিহর রায় মহাশয়ের।'[২১] তবে জীবনের সংঘাত সংঘর্ষের উত্তাপে সেই স্বপ্নাচ্ছন্নতা কর্পূরের মতো উড়ে গেল। 'যৌবনের স্বপ্নজাল জীবন-মধ্যাহ্নে কুয়াসার মতো দিগন্তে মিলাইয়া গেল'।[২২] আজ এই প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় ধর্মসঙ্গিনী সর্বজয়ার তির্যক-বাণী তাকে স্বপ্নলোকে ফিরিয়ে দিল। 'পুরাণ পাঠ করা' তার পরিচিত, অভ্যস্ত বিষয়। শিষ্য বাড়িতে এরকম করতেই হতো। তীর্থস্থানে যাত্রীদের মধ্যে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক রাজধানীতে, অনিয়ন্ত্রিত জনতার মাঝখানে এই নতুন পটভূমিতে প্রাথমিকভাবে উৎরে গেল হরিহর। 'ভিড় মন্দ হয় না।'[২৩]

কিছুদিনের মধ্যেই পেশায় এল প্রতিযোগিতা। দেবনাগরী বর্ণ না জানা 'বাঙাল' কথক ঠাকুর অন্য উপায়ে লোক জড়ো করে। হরিহর বোঝে নতুন সময়ে পুরনো ধ্রুপদী পুরাণ-নিষ্ঠা নয়— 'বাঙাল' কথক 'শুধু ছড়া কেটে মেয়ে ভুলিয়ে পয়সা নেয়।' তাই 'গোটাকতক পালা' লিখবে হরিহর— 'গান থাকবে, কথকতার মতও থাকবে।' শুরু হলো নতুন সাধনা। কয়েকদিন ধরে তার কথকতা শুনতে 'বেশ ভিড়' হচ্ছে। উৎসাহ পেয়ে 'হরিহর পুরাতন খাতাপত্রের তাড়া আবার' বের করে। সর্বজয়া বলে, 'ধ্রুব চরিত্র শুনতে শুনতে লোকের কান যে ঝালাপালা হলো, নতুন একটা কিছু ধরো না!'[২৪] সৃজনশীল মানুষকে উৎসাহ দেবার মানুষ চাই— সেই মানুষ যদি সহধর্মিণী হয়, তার তুলনাই হয় না। কখনো শুনতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ, কখনো নতুন পালা রচনার অনুরোধ— হরিহরের পথের পাঁচালী এগিয়ে চলে। 'জড় ভরতের উপাখ্যান' লিখে ফেলল হরিহর। বাইশ বছর আগে এই বারাণসীতেই হরিহর 'গীত গোবিন্দের পদ্যানুবাদ' করেছিল। পরে নিশ্চিন্দিপুরে গিয়ে বুঝতে পারে সময় বদলে গেছে। চারিদিকে 'দাশুরায়ের গান, দেওয়ানজীর গান, গোবিন্দ অধিকারীর শুকসারীর দ্বন্দ্ব, লোকা ধোপার দলের মতি জুড়ির গানের বিস্তৃত প্রচলন ও পসার তাহার মনে একটা নতুন ধরনের প্রভাব বিস্তার করিল।'[২৫] হরিহর ভেবেছিল এই ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়েই নতুন শিল্পসম্ভার গড়ে উঠবে। তবে তা ছিল ইতিহাসের ধারার স্বাভাবিক গতিকে অস্বীকার করা, মোড় ফেরানোর ব্যর্থ চেষ্টা।

ইতিমধ্যে বদলে গেছে সময়। মধুসুদনের 'বীরাঙ্গনা'র ছেঁড়া বইটি মন দিয়ে পড়লেই হরিহর ঠিক বুঝতে পারত। হরিহর কতটা অনুধাবন করেছিল জানি না। অপূর্ব রায়কে আকর্ষণ করেছিল এই নতুন কবিত্বের আকর্ষণ। সেই সঙ্গে তার মনে এসেছিল নতুন এক বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা। সে ক্ষুধা জ্ঞানের, তথ্যের বিস্ময়ের আর অজানাকে জানার ক্ষুধা। যাত্রাপালার অনুকরণে পালা লেখার আকর্ষণ তার উপরেও বর্তেছিল— 'বিচিত্র কেতুর যুদ্ধে'র আকর্ষণ তাকেও বিনিদ্র করে রাখত। সে দেখেছে নতুন সংযোগ ব্যবস্থা— ডাক ব্যবস্থা, চিঠি আদান-প্রদান, বাবার পাঠানো 'খরচ' কীভাবে পিওনের মাধ্যমে আসে— জেনেছে দারিদ্র্য অনিশ্চয়তার মধ্যে।

নতুন একটি মাধ্যমের ইশারা দুর্গাকে আশ্চর্য করেছিল— তার নাম জানত না দুর্গা। 'সিনেমা বাক্স', সেই একবারই এসেছিল গ্রামে। তবে তার অভিঘাত ছিল দূর সঞ্চারী। বুড়ো মুসলমান তার পয়সা নেই দেখেও ডেকে দেখিয়েছিল— 'তাজ বিবিকা রোজা দেখো, হাতী বাঘকা লড়াই দেখো।' সেই 'দশ মিনিটের কথার' কোনো বর্ণনা করতে পারে না দুর্গা। তখন তার নিয়মিত জ্বর আসে। ঠিকমতো বলতেই পারেনি কী আশ্চর্য ছিল তার অভিজ্ঞতা। 'সত্যিকারের মানুষ ছবিতে কি করিয়া দেখা যায়?'[২৬] অপু আভাস পেয়েছিল।

অপুর মন বদলে গেল শহর থেকে আসা ইংরেজি মাধ্যমে পড়া সুরেশের কথাবার্তা চালচলনে। নীলমণি রায়ের বড় ছেলেটি পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। অপু তখনও স্কুলেই যায় না— পাঠশালার পরে পাঠ অগ্রসর হয়নি। দোলের ছুটিতে এসে গ্রামের ছেলেদের 'দিগ্বিজয়ী নৈয়ায়িক পণ্ডিতের' মতো প্রশ্ন করে করে নিজের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল। অপুকে জিজ্ঞাসা করল— 'ইন্ডিয়ার বাউন্ডারি কী? জিওগ্রাফী জানো?' অপু এসব জানে না, শুধু কী তাই— 'যখন সুরেশ উপেক্ষার ভঙ্গিতে জানতে চাইল, অঙ্ক কি কষেছ?' ডেসিমল্ ফ্রাকশান করতে পারো?।'[২৭] অপুর জানার সীমা ছিল ছেঁড়া ছেঁড়া— 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার বান্ডিল পড়ে সে জেনেছে বহু রহস্যময় অভিযাত্রার কথা। কিন্তু 'মোটে ভাগ পর্যন্ত অঙ্ক জানে, ইতিহাস নয়, ব্যাকরণ নয়, জ্যামিত পরিমিতির নামও শোনে নাই, ইংরাজির দৌড় ফার্স্ট বুকের গোড়ার পাতা।'।[২৮]

বাবার দপ্তরে ছিল বিদ্যাসাগরের লেখা 'চরিতমালা।' সেখানে অপু পড়েছিল আলু বিক্রি করা কৃষকের ছেলে রাস্কো-র বীজগণিতে বিশেষজ্ঞ হওয়ার কথা, মেষপালক ডুবালের ভূচিত্র-বিদ হয়ে ওঠার আশ্চর্য কথা। ক্রমে ক্রমে সীমিত স্বশিক্ষা তার মনে জাগিয়ে তুলল এক নতুন আকাঙ্ক্ষা— তার মনে এই নতুন আকাঙ্ক্ষা তাকে পিতার পথের পাঁচালী অতিক্রম করার দুঃসাহস জোগাল। 'সে এই হাতের লেখা শিখিতে চায় না, ধারাপাত কী শুভঙ্করী এসব তাহার ভালো লাগে না।' সে চায় পশ্চিমী শিক্ষা— তার এই নতুনের আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই বিদ্রোহের মতো। এই গ্রাম্য চিরাচরিত শিক্ষায় তার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হচ্ছিল না। 'এই কড়ি কষার আর্যা', 'এই নামতা'য় তার ক্ষুধা মিটছে না। 'মা বকিলে কী হইবে, যাহা সে পড়িতে চায়, তাহা এখানে কই?'।[২৯] একে মনে হয় গ্রাম বাংলায় নবজাগরণের বিলম্বিত অভ্যুদয়।

১৮৩৪ নাগাদ সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার্থীরা Committee of Public Instruction-এর উদ্দেশ্যে একটি আবেদন করে। তাদের দাবি, ইংরেজি শিখতে চায়। পুরনো টোল চতুষ্পাঠীর বিদ্যা এখন আর কর্মমুখী থাকছে না। এই চিঠি গেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক-এর কাছে। উইলিয়াম অ্যাডামস্ হলেন শিক্ষা কমিশনের দায়িত্ব পেলেন।[২৯] সেই শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে লর্ড মেকলে ১৮৩৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে লিখলেন 'To sum up what I have said... that English is better worth knowing than Sanskrit or Arabic; that the natives are desirous to be taught English and are not

desirous to be taught Sanskrit or Arabic'[৩০]। মেকলের শিক্ষানীতি ভারতের চিরাচরিত বিদ্যাশিক্ষার পক্ষে বিপজ্জনক হয়েছিল— ভারততত্ত্ব বিদ্যার মৃত্যুর চিহ্নও স্পষ্ট হয়েছিল। ডেভিড কফের গবেষণায় এ বিষয়টি দেখেছি। এই গবেষণা গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'Macaulayism and the Defeat of the Orientalist'[৩১]। উৎসাহী পাঠক এই পরিচ্ছেদ পড়লে বুঝবেন নতুন শিক্ষানীতি কেমন করে হরিহরদের পথ ও পাঁচালীর জগৎকে পরাভূত করল আর অপুদের পথের পাঁচালী নতুন পথের দেবতার ডাক শুনতে পেল।

কৌলীন্য প্রথা বল্লালী আমলের বালাই। বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় এই গ্লানি দুর্মোচ্য। এই ব্যবস্থার দুটি নিষ্ঠুর পরিণতির ইঙ্গিত আছে উপন্যাসে। ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়কে ঘিরে যে লোক প্রচলিত কাহিনিকে বলব পথের পাঁচালীকে সাগা (Saga) তথা বংশ পরম্পরার স্মৃতিচিহ্নিত সংরূপের ইঙ্গিত দিয়েছে। 'তখনকার কালে অনেক সমৃদ্ধিশালী গৃহস্থও ডাকাতি' করত, বিষ্ণুরাম রায়ের পুত্র মূর্খ বীরু রায় ছিল ঠ্যাঙাড়ে দলের সরদার। নিষ্ঠুর ভাবে এক ব্রাহ্মণ পথিককে সপুত্র হত্যা করে সে। মূর্খ বীরু রায়ের একমাত্র পুত্র হলুদবেড়ে গ্রাম থেকে ফেরার পথে ইছামতী নদীতে কুমিরের গ্রাসে পড়ে। একে হয়ত Poetic justice বলা যায়। বিভূতিভূষণের ভাষায় 'অদৃশ্য ধর্মাধিকরণের দণ্ড' — আর তাই 'বংশের জ্যেষ্ঠ সন্তান কখনো বাঁচিত না।'[৩২]

এই নিষ্ঠুরতার পাশে ছিল অন্য এক গোপন নিষ্ঠুরতা। কুলীন কন্যাদের পক্ষে তা কেমন ছিল— ইন্দির ঠাকরুণের মাধ্যমে তা স্পষ্ট হয়েছে। সারা জীবন এই ভাগ্য বিড়ম্বিত মহিলাদের হয় চিতায় যেতে হতো না হয় সারা জীবন দগ্ধে মরতে হতো। বল্লাল সেনের নির্দেশে এই কৌলীন্য প্রথার বালাই— যা মূর্খ খুনি ঠ্যাঙাড়ে আর অবলা কুলীন কামিনীদের হাহাকারের মাঝখানে হরিহর ব্যতিক্রম। তারকেশ্বরের মাদুলির গুণ হোক, ব্রহ্মশাপের তেজ 'কর্পূরের মতো' উবে যাওয়ার কারণেই হোক হরিহর বেঁচে থাকল। সমাজে পরিবারে কৌলীন্যের আভিজাত্য ক্ষয় পেল। সর্বজয়া আর হরিহরের দাম্পত্য জীবন তো বিবাহ ব্যবসায়ী কুলীন পুরুষ আর ইন্দির ঠাকরুণের মতো অতৃপ্ত দীর্ঘশ্বাসে পূর্ণ ছিল না।

স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের মধ্য দিয়ে হরিহর-সর্বজয়ার দাম্পত্য জীবন ঢেউ ভেঙ্গে ভেঙ্গে এগিয়েছে। পানফল সংগ্রহের দিন অপু মাটি খুঁড়ে মজুমদারদের পরিত্যক্ত ভিটেতে 'গোলমতো একদিক ছুঁচোলো পল কাটা কাটা চকচকে' যে জিনিসটা পায় তা বোধহয় হীরে। দুর্গা ভেবেছিল। অপুরও 'রূপকথার রাজপুত্র ও রাজকন্যার হীরামুক্তার' কথা মনে পড়েছিল। 'সর্বজয়ারও হীরক সম্বন্ধে ধারণা' ছিল না। ছিল না হরিহরেরও। তবে দুর্গা মনে করায় 'মজুমদারেরা বড়লোক ছিল তো মা? ওদের ভিটের জঙ্গলে কারা নাকি মোহর কুড়িয়ে

পেয়েছিল— পিসি গল্প করতো।[৩৩] যে কুলীন ব্রাহ্মণরা লুণ্ঠন করেছিল অন্য পথচারীর সর্বস্ব, স্বজাতি নারীদের জীবন-যৌবন, তাদের পরের প্রজন্ম 'অদৃশ্য ধর্মাধিকরণের' কাছে এমন স্বপ্ন-দর্শী ভিক্ষুক হয়ে গেল! বাংলার সমাজ জীবনে, চিরাচরিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বর্গ গঠনে (traditional middleclass formation) এই স্বপ্নভঙ্গের অভিঘাতটি চমৎকার, নির্মোহ, অনিবার্য মনে হয়। হরিহর ফিরলে সর্বজয়ার স্বপ্ন তার মধ্যেও সঞ্চারিত হলো। যা ছিল সর্বজয়ার 'সমস্ত গা দিয়া যেন কিসের স্রোত বহিয়া গেল, ... নানা সংশয়ের বাধা ঠেলিয়া একটা গাঢ় দুরাশা ভয়ে ভয়ে একটু উঁকি মারিল— সত্যিই যদি হীরে হয়, তা হলে।'[৩৪] হরিহর বলল, 'ঠিক বুঝতে পারচি নে।' তবে তারও মনে স্বপ্ন সঞ্চারিত হলো— মনে হল, 'কথায় বলে,কপালে না থাকিলে গুপ্তধন হাতে পড়িলেও চেনা যায় না— শেষে কী দরিদ্র ব্রাহ্মণের গল্পের মতো ঘটিবে!'[৩৫] গাঙ্গুলী মশাইয়ের জামাই সত্যবাবু জানিয়ে দিল 'এ একরকম বেলোয়ারী কাঁচ— ঝাড় লণ্ঠনে ঝুলানো থাকে।' রূপকথার গুপ্তধন নতুন বৈভবের প্রতিনিধি ঝাড়লণ্ঠনের কাঁচে পরিণত হওয়াটা স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের মরমী এক জীবনকথার টুকরোই বলতে হবে।

'ঝোপ জঙ্গলের অন্ধকারে ঝিঙের বিচির মতো কালো' হয়ে এলে 'গ্রামের বিস্মৃতা অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশালক্ষ্মী'কে অনুভব করে অপু। খেলতে খেলতে গিয়ে দুর্গা-অপু হঠাৎ হাজির হয় 'আতুরী বুড়ি'র ভিটেয়। এসবই ঠিক যেন আজকের বিখ্যাত জাদু বাস্তবতা (inagic realism)। এসবই অপুর মতো এক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন শিশু পর্যটকের ভাবনা। 'পুলিন শালিনী ইছামতীর ডালিমের রোয়ার মতো স্বচ্ছ জলের ধারে' সেই পরিত্যক্ত দেবী 'এ গ্রামকে এখনো ভোলেন নাই।' কবে কোন জনশ্রুতির 'স্বরূপ চক্রবর্তীর পর' তাকে কেউ দেখেনি, তবে অপু অনুভব করে 'বাসক ফুলের মাথা', 'ছাতিম ফুলের দল', 'নীল পাপড়ি কলমী ফুলের দল ভিড়' পাকিয়ে থাকে— আর এই সবের মধ্যেই দেবী বিশালাক্ষ্মী 'রূপের স্নিগ্ধ আলোয় বন' ভরে দিয়ে যান। দিনের আলো ফোটার আগেই বনলক্ষ্মী হারিয়ে যায়।।[৩৬] এসব জায়গায় মনেই হয় 'পথের পাঁচালী' বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসেরও ভূমিকা তৈরি করে হয়তো। এসব বর্ণনা পড়ে পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শ প্রভাবিত 'আধুনিক' সাহিত্য সমালোচকবর্গ ঠিক পশ্চিমা অনুবাদকদের মতোই 'পথের পাঁচালী'কে খণ্ড করে পড়তে চান। যে মৌখিক সাহিত্য ধারা প্রাচীন ধ্রুপদী সাহিত্য থেকে রস গ্রহণ করে কথকতা পালাগান শ্যামা বিষয়ক হতে হতে পাঁচালীতে পরিণত হয়— তা ঠিক মতো খেয়াল করলে তারা নিশ্চয় স্বীকার করবেন, 'পথের পাঁচালী' অপুর পথের পাঁচালী নয়— এ উপন্যাসের প্রকৃত নায়ক হরিহরের পথ ও তার পাঁচালী অবলম্বনে বেঁচে থাকার স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের আখ্যান।

বনগাঁ-আষাঢু-দুর্গাপুর-টাকী থেকে কলকাতা তো খুব দূর নয়। তবু অপুকে এত দীর্ঘপথ পর্যটন করতে হলো কেন? নিশ্চিন্দপুর থেকে মাঝেরহাট রানাঘাট হয়ে সর্বজয়ার আড়ংঘাটার মেলায় যাওয়া সেই রেলযাত্রার পথ ছাড়িয়ে যেতে হলো রানাঘাট। সেখান থেকে কাশী। তারপর 'অপরাজিত' থেকে দৃশ্যাহরণ করলেন মহান শিল্পী সত্যজিৎ রায়। হরিহরের হাতের ঘটি ঠং ঠং করে পড়ে গেল দশাশ্বমেধ ঘাটের রক্তবর্ণের বড় বড় ধাপ ধাপ সিঁড়ি ধরে— 'ইছামতী'র আঞ্চলিক মিশে গেল সর্বভারতীয় পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার জাতীয়তার (national) বৃহৎ ঐতিহ্যে (greater tradition)। কবে এতো 'অপরাজিতের' দৃশ্য। সত্যজিৎও বিভূতিভূষণের শাসন মেনে পথের পাঁচালী শেষ করেন হরিহরের ভিটের একটি সাপের ধীর অনুপ্রবেশের মাধ্যমে। ঠিক যেন দাঁড়াশ— বাস্তু সাপ। বিভূতিভূষণ লিখেছিলেন, 'কতদিনের পৈতৃক ভিটা', 'পিতা রামচাঁদ তর্কবাগীশ'-এর ভিটের 'মাটির প্রদীপ টিমটিম করিতে ছিল'— 'আজ সন্ধ্যা হইতে চিরদিনের জন্য নিবিয়া গেল।।[৩৭]

অপুর পথ অপুর মতো তীর্থ শহর কাশীতে থামতে পারে না। সে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অভিঘাতে গড়ে ওঠা দক্ষিণ এশিয়ার মহানগর কলকাতার নায়ক। তাকে তাই কলকাতায় ফিরতে হয়। মাঝেরপাড়া থেকে রাণাঘাট, ব্যান্ডেল হয়ে সেই যে পথ, যা ছিল পারিবারিক— তা হলো একান্ত ব্যক্তিগত। 'মনসা পোতা'র জীবনের ছক ভেঙ্গে সর্বজয়াকে একা রেখে সেই পথ কলকাতার অন্ধকার ছাপাখানায়, গোলদীঘির বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় স্বপ্নের নতুন এক যাত্রার দিকে অগ্রসর হলো। জীবন প্রস্তুতির সময় পিতা হরিহরও বারাণসীতে এমন স্বপ্নাচ্ছন্ন ছিল নাকি! যদি প্রশ্ন করি আজকের 'ইছামতী-এক্সপ্রেস' বা 'বনগাঁ লোকাল' ধরে কয়েক ঘণ্টার যাত্রাপথের পাঁচালী এত ঘুরপাক খেল কেন? উত্তর হলো ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের দিন এত সহজে কী দিনান্তের প্রদীপ হয়ে জ্বলে?

বারাণসীর সেই বাঙাল অল্প শিক্ষিত লোভী কথকের চিত্র মনে পড়ছে। ভদ্রলোক শ্রোত্রীয়। তাদের কন্যাপণ জোগাড় করতে হয়। শ্রোত্রীয় আর কুলীন— ব্রাহ্মণ সমাজের এই বল্লালী প্রথা হরিহরের কালে হারিয়ে গেছে, কিন্তু ওই দরিদ্র কথক ঠাকুরের পথ ও পাঁচালী তখনও শেষ হয়নি। হরিহরের পথ ও পাঁচালী দশাশ্বমেধ ঘাটে শেষ হয়— অপুর পথ ও পদাতিক জীবন শুরু হয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক মহানগরে। সে তো ভিন্ন আখ্যান।

অনুষঙ্গ

১। ইংরেজি অনুবাদক টি. ডব্লিউ. ক্লার্ক এবং অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায়; ফরাসি অনুবাদক শ্রীমতী ফ্রান্স ভট্টাচার্য। সাহিত্য আকাদেমি ও UNESCO -র উদ্যোগে এই অনুবাদ দুটি যথাক্রমে ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয়।

২। সূত্র : 'পথের পাঁচালী' : রচনা ও প্রকাশন— জিতেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, ভাদ্র ১৩৭৯; 'পথের পাঁচালী', মিত্র ও ঘোষ পেপারব্যাক ক্লাসিক্স্; ষোড়শ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ। ৫ পৃঃ।

৩। তদেব, ৯ পৃঃ।

৪। তদেব।

৫। দেখুন : অচিন্ত্য বিশ্বাস : 'মিখাইল বাখতিন উপন্যাস তত্ত্ব'; বিদ্যা, জানুয়ারি ২০১৪, ১০৯ পৃঃ।

৬। Mikhail Bakhtin : "Forms of Time and Chronotope in the Novel" শীর্ষক প্রবন্ধ, 'The Dialogic Imagination', ২৫৪ পৃঃ।

৭। দেখুন 'Anatomy of Criticism' প্রিন্সটন, নিউ জার্সি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; ১৮৫৭।

৮। দেখুন : অচিন্ত্য বিশ্বাস : 'পুরাকথা, সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য ভাবনা' — শীর্ষক প্রবন্ধ; নবেন্দু সেন সম্পাদিত 'পাশ্চাত্য সাহিত্য তত্ত্ব ও সাহিত্য ভাবনা', রত্নাবলী; কলকাতা; জুন ২০০৯; ৩৩২ পৃঃ।

৯। 'পথের পাঁচালী' ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, শেষ বাক্য। উক্ত ২০ পৃঃ।

১০। ওই; 'অক্রূর সংবাদ' — পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ; ১৮০ পৃঃ।

১১। ওই; 'আম আঁটির ভেঁপু'— পঞ্চম পরিচ্ছেদ, ২৮ পৃঃ।

১২। তদেব; ২৯ পৃঃ।

১৩। ওই।

১৪। তবেদ; ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ; ৮৯ পৃঃ।

১৫। তবেদ; ৯১ পৃঃ।

১৬। তদেব; বিংশ পরিচ্ছেদ, ৯২ পৃঃ।

১৭। তদেব; ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ, ১১৭ পৃঃ।

১৮। তদেব; সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ, ১২১ পৃঃ।

১৯। তদেব; ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ, ১১৭ পৃঃ।

২০। তদেব; 'অক্রূর সংবাদ'; ত্রিংশ পরিচ্ছেদ; ১৪৮ পৃঃ।

২১। তদেব; ১৪০ পৃঃ।

২২। তদেব।

২৩। তদেব; ১৪৮ পৃঃ।

২৪। তদেব; ১৪৯ পৃঃ।

২৫। তদেব।

২৬। তদেব; চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ, ১০৯ পৃঃ।

২৭। সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ, ১১৯ পৃঃ।

২৭। তদেব।

২৮। চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ, ১১০ পৃঃ।

২৯। শিবনাথ শাস্ত্রী : 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'; নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা; তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৮৪ ব., ৬১-৬২ পৃঃ। উইলিয়াম অ্যাডাম ছিলেন রাজা রাধাকান্দ দেব ও রাজা রামমোহন রায়-সহ বহু বিশিষ্ট কলকাতাবাসী নাগরিকের পরিচিত।

৩০। Macauley, Thomas B : 'Minutes on Education'; আমরা উল্লেখ করছি, শিবনাথ শাস্ত্রী : 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'; উক্ত; ১৪১ পৃঃ থেকে।

৩১। David Kopf : 'British Orientalism and the Bengal Renaissance (The Dynamics of Indian Modernization 1773-1835)' ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়; কলকাতা, ১৯৬৯; XIV - Chapter. ২৩৬-২৫২ পৃঃ।

৩২। 'পথের পাঁচালী'; উক্ত; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ৮ পৃঃ।

৩৩। তদেব; উক্ত; একাদশ পরিচ্ছেদ; ৩৯ পৃঃ।

৩৪। তদেব; ৪০ পৃঃ।

৩৫। তদেব।

৩৬। তদেব; ষোড়শ পরিচ্ছেদ, ৭৬ পৃঃ।

৩৭। তদেব; ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ, ১৪০ পৃঃ।

smc
Moneywise. Be wise.

SMC WISHES YOU A
HAPPY DURGA PUJA

Call Toll-Free
1800 11 0909
www. smctradeonline.com

Broking - Equity, Commodity & Currency | Wealth Management | Insurance Broking | Real Estate Advisory | Mortgage Advisory | Distribution of IPOs, Mutual Funds, FDs & Bonds | Investment Banking | NBFC Financing | PMS | Institutional Broking | Clearing Services | NRI & FPI Services | Research

DELHI | MUMBAI | KOLKATA | AHMEDABAD | CHENNAI | BENGALURU | DUBAI

SMC Global Securities Ltd., CIN No.: L74899DL1994PLC063609 | REGISTERED OFFICE: 11/6-B, Shanti Chamber, Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel +91-11-30111000 | SMC Comtrade Ltd., CIN : U67120DL1997PLC188881

SEBI Reg. No. INZ000199438, Member: BSE (470), NSE (07714) & MSEI (1002), DP SEBI Regn. No. CDSL/NSDL-IN-DP-130-2015, Mutual Funds Distributor ARN No. 29345. SMC Comtrade Ltd. SEBI Regn. No. INZ000035839, Member: NCDEX (00021), MCX (8200) & ICEX (1010). SMC Investments and Advisors Limited, SEBI PMS Regn. No. INP000003435. SMC Insurance Brokers Pvt. Ltd. IRDAI Regn. No: DB 272/04 License No. 289 Valid upto 27/01/2020.

Investment in securities market are subject to market risks, read all the related documents carefully before investing

Follow us on

আমার বন্ধু পার্থ

রমানাথ রায়

পার্থ আমার বন্ধু। পার্থর সঙ্গে আমি গল্প করি, ঘুরে বেড়াই। মাঝে মাঝে একসঙ্গে ঝালমুড়ি খাই, ফুচকা খাই, ঘুগনি খাই। আসলে আমি পার্থকে ভালোবাসি। কিন্তু এই ভালোবাসা, এই বন্ধুত্ব যে আমার কাল হয়ে দাঁড়াবে তা জানতাম না। একদিন জানলাম, সেদিন অফিস থেকে ফিরে সবে টিভির সামনে বসেছি। এমন সময় আমার মোবাইল বেজে উঠল। স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে দেখি একটা অচেনা নাম্বার।

আমি ফোনটা ধরলাম, হ্যালো...

ওদিক থেকে প্রশ্ন ভেসে এলো, আমি কি অনিলবাবুর সঙ্গে কথা বলছি?

— বলছেন।

— আমি আমাদের দলের মুখ্য সচিবের অফিস থেকে বলছি।

— বলুন।

— আপনার বিরুদ্ধে একটা মারাত্মক অভিযোগ আছে।

— কী অভিযোগ?

— পার্থ রায় আপনার কে হন?

— পার্থ আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু।

— আপনি পার্থবাবুর সঙ্গে ঝালমুড়ি খান?

— খাই।

— ফুচকা খান?

— খাই।

— ঘুগনি খান?

— খাই।

— এটা খুব দলবিরোধী কাজ।

— কেন?

— কারণ, এই পার্থ রায় একসময় আমাদের দলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এখন তিনি আমাদের দল ত্যাগ করে অন্য দলে ভিড়েছেন। আপনি কি তা জানেন?

— জানি।

— তবুও আপনি পার্থ রায়ের সঙ্গে ঝালমুড়ি খান? ফুচকা খান? ঘুগনি খান?

— খাই। আমি এতে কোনো অপরাধ দেখছি না। যদি না খেতাম তাহলেই অপরাধ হতো। আমি একটা ঠুন্‌কো রাজনীতির জন্য বন্ধুকে বিসর্জন দিতে পারি না।

— কী বলছেন আপনি! এটা দলবিরোধী কাজ। মুখ্যসচিব আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

— আমার সময় নেই। আমি এখন টিভি দেখব।

— এখন টিভি দেখা আপনার কাছে বড়ো হয়ে উঠল?

— হ্যাঁ। — বলে একটু হেসে বললাম, আপনি দয়া করে এখন আমাকে বিরক্ত করবেন না।

— এর ফল আপনাকে পেতে হবে।

— আমি তার জন্য তৈরি আছি। — বলে ফোন বন্ধ করে দিলাম।

।। ২।।

আমরা আমিষাশী। তাই বলে নিরামিষাশীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব চলবে না! তাদের সঙ্গে ঝালমুড়ি খাওয়া চলবে না! ফুচকা খাওয়া চলবে না! ঘুগনি খাওয়া চলবে না! এ তো একেবারে কালা কানুন। না, এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। এর একটা প্রতিবাদ হওয়া দরকার। আমি দরকার হলে আমাদের দলের সর্বোচ্চ নেতার সঙ্গে দেখা করব। বলব, এ হয় না। এ হতে পারে না। তিনি যদি আমার কথা না শোনেন তাহলে আমি দল ছাড়ব। নিরামিষাশীদের দলে নাম লেখাব। পার্থ তো এই কারণেই দল ছেড়েছিল। তাকে বলা হয়েছিল, কী কী বই পড়বে, কী কী বই পড়বে না। তাতে পার্থ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, আমার যে বই পড়তে ভালো লাগে আমি সেই বই পড়ব। আপনাদের নির্দেশ মতো বই পড়ব না। ব্যাস! তাতেই গোলমাল বেধে যায়। পার্থ আমিষাশীদের দল ছেড়ে নিরামিষাশীদের দলে নাম লেখায়। আমাকেও হয়তো শেষপর্যন্ত তাই করতে হবে।

আমি একদিন পার্থর ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হলাম। পার্থ আমাকে সোফায় এনে বসাল।

পার্থ জিজ্ঞেস করল, কী খবর?

বললাম, ভালো নয়।

— কেন?

আমি উত্তরে যা বলার তা বললাম।

পার্থ সব শুনে বলল, আমি আমিষাশীদের দল ছেড়ে ভালো আছি। নিরামিষ খাবার খেয়ে শরীর ঠিক আছে। মন ঠিক আছে। কোনো অসুখ-বিসুখ নেই বললেই চলে। ডাক্তারের খরচ এখন যৎসামান্য। আমার পরামর্শ হলো, তুই আমিষাশীদের দল ছেড়ে আমাদের দলে আয়। তুই ভালো থাকবি।

— সে আমি জানি। কিন্তু...

— কিন্তু কী?

— তোদের বাড়িতে সবাই নিরামিষাশী। আমাদের বাড়িতে সবাই আমিষাশী। আমাদের বাড়িতে রোজ মাছ রান্না হয়। মাছ ছাড়া আমাদের মুখে ভাত উঠবে না। মাছ আমাদের চাই।

— তাতে অসুবিধা নেই। বাড়ির সবাই মাছ-মাংস খাক। তুই না খেলেই হলো।

— আমার এতে অসুবিধা নেই। কিন্তু ছোঁয়াছুঁয়ি এড়াবো কী করে?

— মানে?

— মাছের ঝোলের বাটির সঙ্গে যদি আমার ডালের বাটির ছোঁয়া লাগে তাহলে তো আমার আর খাওয়া হবে না। শুধু তাই নয়, যে বঁটিতে মাছ কাটছে সেই বঁটিতে আমার কুমড়ো বা আলু কাটছে কিনা তা আমাকে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে হবে। আমাদের রাঁধুনির দিকে সবসময় নজর রাখতে হবে। সে কি সম্ভব?

— তাহলে এক কাজ কর।

— কী?

— বাড়ির সকলকে নিরামিষাশী করে তোল।

— দেখি, কী করা যায়।

।। ৩।।

নিরামিষাশীরাও কম যায় না। তারা এখন আমার মতো আমিষাশীদের দলে টানতে চাইছে। পার্থ আমিষাশীদের দল ছেড়ে নিরামিষাশী হয়েছে। হতে কোনো অসুবিধা হয়নি। কারণ, সংসারে ওরা মাত্র

দুজন। একজন পার্থ, আর একজন ওর বিধবা মা। ওর মা মাছ-মাংসের গন্ধ একদম সহ্য করতে পারে না। ফলে ওদের বাড়িতে মাছ-মাংস এমনিতেই ঢুকত না। মাছ-মাংস খাবার ইচ্ছে হলে পার্থ রেস্তোরাঁয় ঢুকে ফিশ ফ্রাই খেত, কষা মাংস খেত। এখন নিরামিষাশীদের দলে ঢুকে সেটাও বন্ধ করে দিয়েছে। আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। আমার বাড়িতে বাবা-মা-ভাই-বোন আছে। মাছ ছাড়া তাদের চলবে না। শুধু তাই নয়, সপ্তাহে প্রতি রবিবার তাদের মাংস চাই। আমি এদের কী করে নিরামিষাশী করব? সম্ভব নয়। তবু একদিন আমি বাবাকে বললাম, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

বাবা জানতে চাইল, কী কথা?

বললাম, শুনেছি নিরামিষ খাবার খেলে শরীর ভালো থাকে। আমরা কী আমিষ ছেড়ে নিরামিষাশী হতে পারি না?

বাবা কয়েক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, তুই কি আজকাল নিরামিষাশীদের সঙ্গে মিশছিস?

— একথা বলছ কেন?

— তোর কথা শুনে তাই মনে হচ্ছে।

— যদি মিশে থাকি তাহলে অপরাধ কোথায়?

— ওরা মোটেও সুবিধার নয়। ওরা ভীষণ গোঁড়া। ওরা যেনতেন প্রকারে তোকে ওদের দলে টানবে। তারপর বুঝবি ঠেলা। ওরা তোকে একেবারে গৃহপালিত গোরু করে দেবে। সেটা কি খুব ভালো হবে? তবে তুই যদি গোরু হতে চাস তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তারপর তোর আর এ বাড়িতে থাকা চলবে না। তোকে ঘর ভাড়া করে আলাদা হয়ে যেতে হবে। তুই কি তা পারবি?

বললাম, না, আমি তোমাদের ছেড়ে আলাদা হতে পারব না।

বাবা বলল, তাহলে নিরামিষাশী হওয়ার চিন্তা একদম মাথায় আনবি না। বুঝেছিস?

বললাম, বুঝেছি।

তারপর পার্থকে ফোন করে বললাম, আমার দ্বারা নিরামিষাশী হওয়া সম্ভব নয়। বাবাকে কথাটা বলতেই বাবা আমার ওপর খুব রেগে গেল। স্পষ্ট ভাষায় বলে দিল, নিরামিষাশী হতে হলে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

— তুই তাতে রাজি হলি না কেন?

— বাবা-মা-ভাই-বোন ছেড়ে আমি আলাদা হতে পারব না।

— তার মানে তুই একটা আস্ত কাপুরুষ।

— তা হতে পারি।

— তুই আর আমার সঙ্গে কোনোদিন মিশবি না। আমি তোর সঙ্গে আর কোনোদিন ঝালমুড়ি খাব না, ফুচকা খাব না, ঘুগনি খাব না।

— তাহলে আমি একাই খাব।

— তা যা। তবে তোর কপালে বিপদ আছে।

— কী বিপদ?

বিপদ এলে বুঝতে পারবি।

।। ৪ ।।

জানি না কী বিপদ আসতে পারে। কিছুদিন আগে আমিষাশীদের কাছ থেকে ধমক খেয়েছি। এখন আমার নিরামিষাশী বন্ধু ধমকাচ্ছে। মহা সমস্যায় পড়ে গেলাম। কী করব এখন? 'যত মত তত পথ'-এর দলে ভিড়ে যাব? এই দল আমিষ ও নিরামিষ-এর বাছবিচার করে না। তারা কারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। যে কেউ নিজের পছন্দমতো বই বা খবরের কাগজ পড়তে পারে। যে কেউ তার ইচ্ছেমতো বন্ধু বেছে নিতে পারে। কোনো অসুবিধা নেই। তবে তাদের একজন গুরু আছে। তার লেখা একটি বই আছে। নাম— গুরু বাক্য। সেখানে সকলকে কয়েকটি নিয়ম মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া আছে। আমি সব নিয়মের উল্লেখ করতে চাই না। শুধু পাঁচটি নিয়মের কথা বলছি। সেই পাঁচটি নিয়ম হলো— এক, তুমি আস্তিক হতে পারো, নাস্তিক হতে পারো, তবে যাই হও না কেন তোমাকে সারাজীবন গুরুকে মান্য করতে হবে।

দুই— গুরু যখন যা বলবেন তাই হবে শিরোধার্য।

তিন— গুরুর নির্দেশ অমান্য করার শাস্তি প্রাণদণ্ড।

চার— কোনো কিছু খাওয়ার আগে গুরুর নাম নেবে।

পাঁচ— কোনো কাজ করার সময় বলবে, গুরুর অনুপ্রেরণায় এই কাজ করছি।

এদের আমি চিনি, জানি। এরা সবাই গুরুবাদে বিশ্বাসী। গুরু ছাড়া এরা কিছু জানে না। গুরুই এদের কাছে সব। আমি এদের দলে ভিড়তে পারি। কিন্তু গুরুবাদে আমার বিশ্বাস নেই। কারণ গুরুই যদি শেষ কথা হয়, তাহলে যত মত তত পথ-এর মূল্য কোথায় থাকল? এ তো এক ধরনের ভণ্ডামি। এই কারণে এই দলটাকে আমার পছন্দ হয় না। এদের চেয়ে আমিষাশীরা অনেক ভালো। তাদের মধ্যে আর যাই হোক, ভণ্ডামি নেই। তবে আমিষাশীদের অনেক জিনিস আমি পছন্দ করি না। এ নিয়ে একটা আলোচনা হওয়া দরকার।

ঠিক এইসময় একদিন মুখ্য সচিবের ফোন এল।

— হ্যালো...

— আমি মুখ্যসচিব বলছি।

— বলুন।

— কিছুদিন আগে আমার অফিস

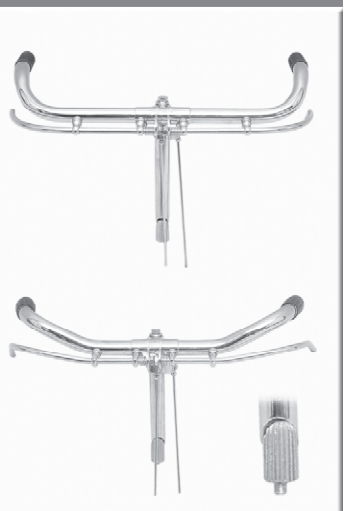

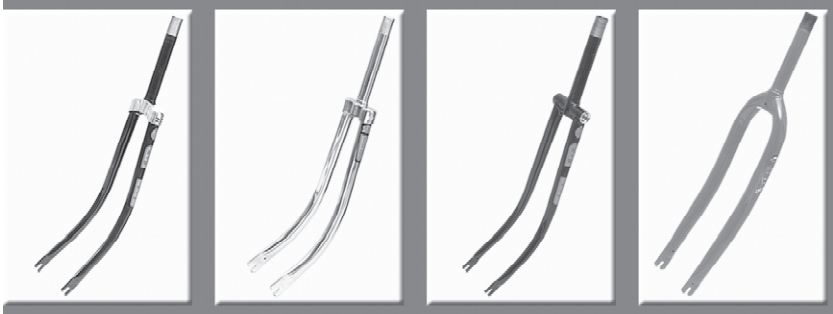

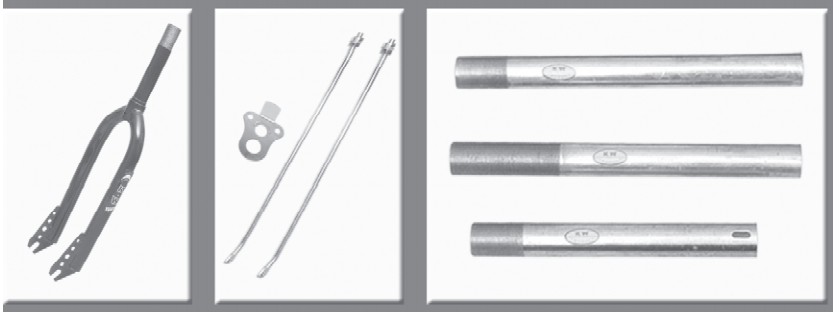

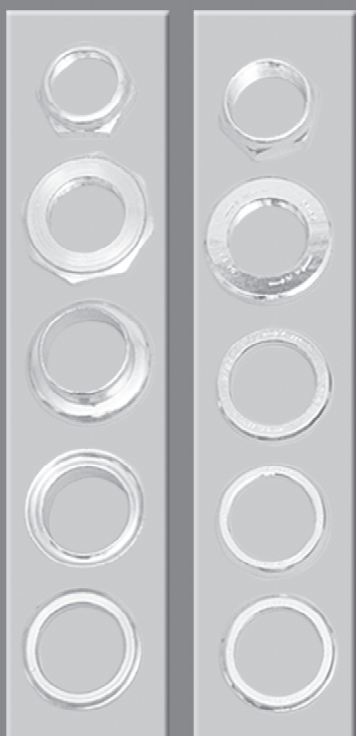

K.W
K.W. ENGG. WORKS (REGD.)
K.W
BICYCLE
K.W
BICYCLE
FORK
The Name of Quality
& Durability
K. W. Engineering Works (Regd.)
B-11, Focal Point, Ludhiana-141010 (Pb) INDIA
Phones : +91-161- 2670051-52-, 2676633
Fax : +91-161-2673250,
E-mail : sales@kwcycles.com,kwengg@sify.com
Website : http:/www.kwcycles.com

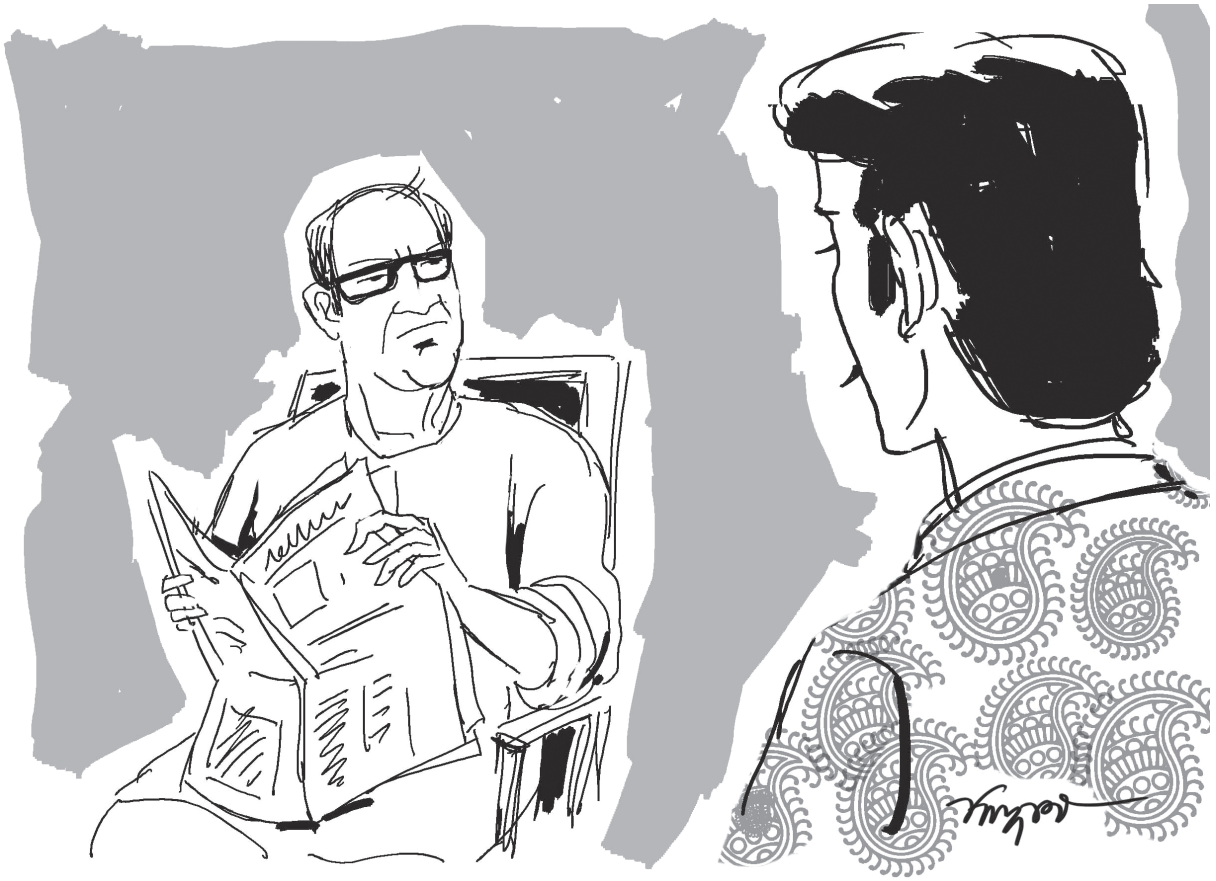

থেকে একজন আপনাকে ফোন করেছিল?

— হ্যাঁ।

— আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম।

— জানি।

— কিন্তু আপনি তখন টিভি দেখায় ব্যস্ত ছিলেন বলে আমার সঙ্গে কথা বলেননি। শুধু তাই নয়, আপনি এতে খুব বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। সত্যি?

— সত্যি।

— আমি এতে রেগে গেছি। আজ বা কাল সন্ধেবেলা আমার সঙ্গে দেখা করুন। আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে। — বলে একটু থেমে মুখ্যসচিব জানতে চাইলেন, আজ আসতে পারবেন?

একটু ভেবে নিয়ে বললাম, আজ হবে না। কাল আসব।

— ঠিক আছে। কালই আসুন। কথার যেন খেলাপ না হয়।

— তা হবে না।

।। ৫ ।।

মুখ্যসচিবের ডাক। একবার উপেক্ষা করেছি। দ্বিতীয়বার আর উপেক্ষা করা সম্ভব হবে না। উচিতও নয়। শুনতে হবে উনি কী বলেন। না শুনলে কপালে দুর্ভোগ। কী দুর্ভোগ হবে বা হতে পারে তা অবশ্য জানি না। জানা সম্ভবও নয়। মুখ্যসচিবের সঙ্গে দেখা হলে সব জানতে পারব। তবে কেন জানি না আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে, ভয় হচ্ছে। যাক গে যা হবার হবে।

ভগবানের নাম নিয়ে আমি মুখ্যসচিবের অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। ঘরে উনি একা বসে আছেন। হয়তো আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

আমাকে দেখে মুখ্যসচিব বললেন, বসুন।

আমি একটা চেয়ার টেনে তার মুখোমুখি বসলাম।

বসতেই মুখ্যসচিব বললেন, আপনি তো জানেন পার্থ একজন দলত্যাগী।

বললাম, জানি।

— আপনি কি জানেন একজন দলত্যাগী মাত্রই আমাদের ঘোর শত্রু। ফলে পার্থ আমাদের আর মিত্র নয়। শত্রু।

— কিন্তু পার্থ যে আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু!

— তা হতে পারে। কিন্তু এখন আর সে আপনার বন্ধু নয়, শত্রু। অতএব তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া আমাদের কাজ।

আমি একথা শুনে আঁতকে উঠলাম, কী বলছেন আপনি!

মুখ্যসচিব বললেন, আমি ঠিক কথাই বলছি। পার্থ ইতিমধ্যে কী করেছে তা জানেন?

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী করেছে?

— আমাদের সাতজন আমিষাশীকে টাকার লোভ দেখিয়ে নিরামিষাশী করেছে।

— তাই নাকি?

— হ্যাঁ। এখন আপনাকে নিরামিষাশী করতে চাইছে। কথাটা কি ঠিক?

আমি আমতা আমতা করে বললাম, ঠিক। কিন্তু আপনি কী করে একথা জানলেন?

মুখ্যসচিব হেসে বললেন, আমার কাছে সব খবরই আসে। আপনি জেনে রাখুন, ওদের মধ্যে আমাদের গুপ্তচর আছে। অবশ্য আমাদের মধ্যেও ওদের গুপ্তচর আছে। ধরা পড়লে আমরা সেই গুপ্তচরকে মেরে ফেলি। ওরাও মেরে ফেলে।

আমি চমকে উঠলাম, এতো খুব ভয়ংকর কথা।

মুখ্যসচিব বললেন, দলকে মজবুত করতে হলে এসব করতে হয়। আপনিও বিপদে পড়ে যাচ্ছিলেন। খুব জোর বেঁচে গেছেন।

— কেন?

— আপনার প্রথম অপরাধ আপনি একজন দলত্যাগীর সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন। দ্বিতীয় অপরাধ, আপনি আমার ডাক উপেক্ষা করেছেন। আমার ডাকের চেয়ে টিভি দেখাটাই বড়ো হয়ে উঠেছিল। আমাকে উপেক্ষা করা যে কত বড়ো অপরাধ তা আপনি জানেন না। আপনি বেঁচে গেছেন শুধু একটা কারণে।

জিজ্ঞেস করলাম, কী কারণ?

— আপনি যে পার্থর ডাকে নিরামিষাশী হননি তার জন্য।

ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এলো। বললাম, আপনি করুণাময়, আমি শুধু অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে আপনার কাছে কোনো কথাই গোপন থাকে না। মুখ্যসচিব আমার কথা শুনে হাসলেন। হেসে বললেন, তবে আপনাকে শুধু একটা উদ্দেশ্য নিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছি।

আবার আমার মধ্যে ভয় ফিরে এলো। জিজ্ঞেস করলাম, কী উদ্দেশ্য?

মুখ্যসচিব বললেন, পার্থ আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। — বলে একটা রিভলবার আমার হাতে তুলে দিলেন।

আমি হতভম্ব হয়ে রিভলবার হাতে নিয়ে বললাম, এই রিভলবার নিয়ে আমি কী করব?

মুখ্যসচিব চোয়াল শক্ত করে বললেন, পার্থকে খুন করতে হবে।

বললাম, পার্থ এখনও আমার বন্ধু। আমি একাজ করতে পারব না। অসম্ভব।

— তাহলে আপনি খুন হবেন। আপনি এবার বেছে নিন কী করবেন।

আমি কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেললাম।

।। ৬ ।।

কী করব আমি? আমি মরতে ভয় পাই না। কারণ আমি ছাড়া বাড়িতে আমার ভাই আছে, বোন, বাবা-মা, তাদের নিয়ে বাঁচতে পারবে। আমি মারা গেলে তাদের দুঃখ হবে ঠিক, কিন্তু আস্তে আস্তে তারা সে দুঃখ সামলে উঠবে। আর পার্থ মারা গেলে ওর মা-র কী হবে? বিধবা মা। পার্থ ছাড়া তার আর কেউ নেই। তার কাছে পার্থই সব। আমি কী এই পার্থকে মারতে পারি? পারি না। পারা সম্ভব নয়। তাহলে? তাহলে আমাকেই মরতে হবে। ঠিক আছে। তাই হবে। তবে মৃত্যুর আগে একটি মেয়েকে ভালোবাসার ইচ্ছে ছিল, ইচ্ছে ছিল তাকে নিয়ে আইসক্রিম খাব। ইচ্ছে ছিল তাকে নিয়ে সুন্দরবন ঘুরে আসব। ইচ্ছে ছিল তাকে নিয়ে আইফেল টাওয়ারের মাথায় উঠব। কিন্তু কপাল খারাপ। আজ পর্যন্ত সেরকম কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ হলো না। মৃত্যুর আগে কাউকে না ভালোবেসে মরার ইচ্ছে আমার নেই।

একদিন মুখ্যসচিব ফোন করলেন, কাজ কতদূর এগোলো?

মিথ্যে কথা বললাম, এগোচ্ছে।

মুখ্যসচিব বললেন, সাবধানে থাকবেন।

— কেন?

— আপনাকে খুন করার জন্য পার্থকে ব্যবহার করা হবে।

— কেন?

— পার্থর কথা শুনে আপনি ওদের দলে যাননি বলে।

— কিন্তু আমার এই মুহূর্তে মরার ইচ্ছে নেই।

— তাহলে আগে পার্থকে খুন করুন। দেরি করবেন না। আর একটা কথা।

— কী!

— সঙ্গে সবসময় রিভলবার রাখবেন।

— রাখব। — বলে ফোন বন্ধ করে দিলাম।

প্রথমে কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তারপর ভেবে দেখলাম, পার্থকে খুন করার দায়িত্ব যদি আমার কাঁধে চাপে, তাহলে আমাকে খুন করার দায়িত্ব পার্থর কাঁধেও চাপতে পারে। আবার আমি যেমন পার্থকে খুন করতে চাইছি না, পার্থও হয়তো আমাকে খুন করতে চাইছে না। আমার মতোই খুন করতে বাধ্য হচ্ছে। আমাকে এখন অপেক্ষা করতে হবে।

।। ৭ ।।

একদিন ঠিক করলাম পার্থকে ফোন করব। ওর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার। কিন্তু তার আগেই পার্থ আমাকে ফোন করল।

— হ্যালো...

— তোর সঙ্গে দরকার আছে।

— আমারও তোর সঙ্গে দরকার আছে।

— তাহলে সামনের রবিবার বিকেল পাঁচটায় আমরা দেখা করব।

— কোথায়?

— ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সামনে।

— এটাই হয়তো আমাদের শেষ দেখা।

— হয়তো।— বলে পার্থ ফোন বন্ধ করে দিল। দেখতে দেখতে রবিবার এলো। আমি ঠিক পাঁচটার সময় পকেটে রিভলবার নিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সামনে এসে হাজির হলাম। দেখি, পার্থ আগেই চলে এসেছে। জিজ্ঞেস করলাম, কতক্ষণ হলো এসেছিস?

পার্থ বলল, পাঁচ মিনিট।

বললাম, এখানে একটু বসবি?

পার্থ বলল, না। বরং একটু হাঁটি।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে একটা বড় গাছের তলায় এসে দাঁড়ালাম। চারপাশ ফাঁকা। কেউ কোথাও নেই।

পার্থ জিজ্ঞেস করল, তোকে কেন এখানে ডেকে এনেছি জানিস?

— জানি।

— কী জানিস?

— আমাকে খুন করবি বলে।

সঙ্গে সঙ্গে পার্থ রিভলবার বের করে আমার দিকে তাক করে বলল, তাহলে তৈরি হ।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে রিভলবার বের করে তার দিকে তাক করে বললাম, তুইও তৈরি হ।

পার্থ হেসে বলল, জানতাম তুইও এরকম একটা কিছু করবি। কিন্তু আমার যে মরার ইচ্ছে নেই।

— কেন?

— আমি একটা মেয়েকে ভালোবাসি। তার জন্য আমি মরতে চাই না। তুই আমাকে ছেড়ে দে। তার সঙ্গে আজ আমার দেখা হওয়ার কথা। আজ আমরা একসঙ্গে সিনেমা দেখব। তুই আমার বন্ধু। তুই আমার কথা রাখ।

আমি তা শুনে বললাম, তাহলে তুই আমার কথা শোন।

পার্থ জানতে চাইল, কী কথা?

বললাম, আমিও ভালোবাসা চাই। কোনো মেয়ের ভালোবাসা না পেয়ে মরতে পারব না। তুই আমার বন্ধু। তুই আমাকে মারিস না। আমার কথা শোন।

পার্থ চিন্তায় পড়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, তাহলে আমরা এখন কী করব?

হেসে বললাম, কী আর করব! এখন আমরা ঝালমুড়ি খাব। ■

MUNJAL SHOWA

Munjal Showa Ltd. is the largest manufacturer of Shock Absorbers, Front Forks, Struts (Gas Charged and Conventional) and Gas Springs for all the leading OEM's in 2 Wheeler/4 Wheeler Industry in the Country. Manufactured Products conform to strict its standard for Quality and Safety. Company's Products enjoy reputation for Smooth, Comfortable, Long-Lasting, Reliable and Safe Ride. The Company is QS 9000, TS – 16949, ISO 14001, OHSAS 18001 and TPM Certified Company. MSL has technical and financial Collaboration with Showa Corporation Japan.

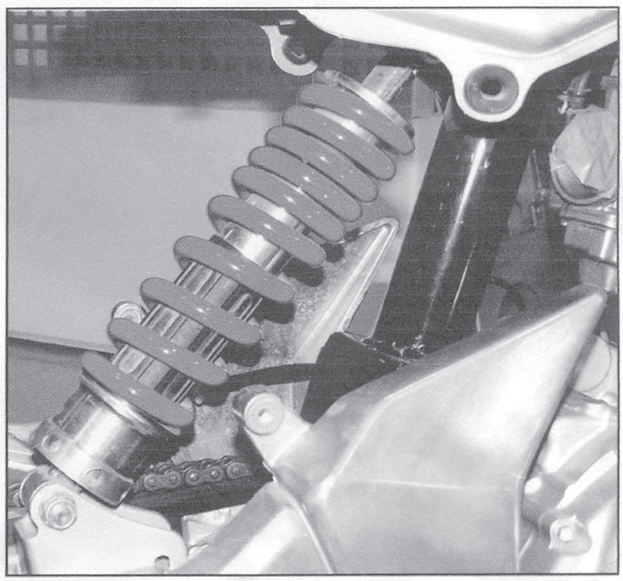

TPM Certified Company

ISO / TS - 16949 – 2002 Certified

ISO - 14001 & OHSAS – 18001 Certified

Our prestigious Client List :

- Hero MotoCorp Ltd.
- Maruti Suzuki India Ltd.
- Honda Cars India Ltd.
- Honda Motorcycle & Scooter India (P) Ltd.
- India Yamaha Motor Pvt. Ltd.

Our Products

- **Struts/Gas Struts**
- **Shock Absorbers**
- **Front Forks; and**
- **Gas Springs**

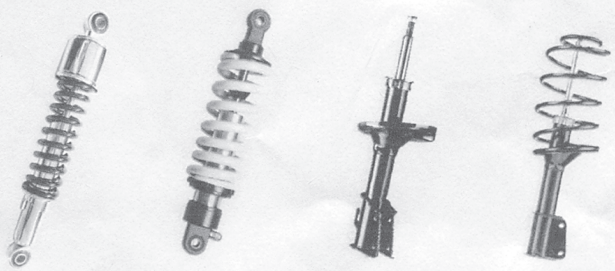

MUNJAL SHOWA LTD.

• Plot No. 9 – 11, Maruti Industrial Area, Gurgaon. Tel. No. : 0124 – 2341001, 4783000, 4783100
• Plot. No. 26 E & F, Sector – 3, Manesar, Gurgaon Tel. No. : 0124 – 4783000, 4783100
• Plot No.1, Industrial Park – II, Village Salempur, Mehdood – Haridwar, Uttarakhand Tel. No. : 0124–4783000, 4783100

সমাপ্তি

এষা দে

কেউ বিশ্বাস করবে এগারো বছরের ছোট্টখাট্টো সইফুদ্দিন, যাকে দেখলে মনে হয় ন'সাল, কোরান মুখস্ত করে হাফিজ হয়েছে। অথচ সেটাই ঘটনা। তাকে ঘিরে আব্বা আম্মির কত গর্ব, কত আশা। এমনিতে তাদের কোনো অভাব নেই। শুখা সিস্তানে হেলমন্দ নদীর দুধারে যে সবুজ আছে তারই মধ্যে অব শিরিন গাঁয়ে তাদের জমিজিরেত, বসবাস। ক'পুরুষের ফল বাগিচা আর গেহু ভাঙার কলের মালিকানায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সংসার। তবে কিনা সৈয়দ বলে কথা। খোদ রসুল হজরত মহম্মদের সিধা ওয়ারিশ। সিলসিলা আছে। বাবা মকতবে পড়া, আরবিতে দুরস্ত। তিনি নিজে সইফুকে তালিম দিয়েছেন। সইফুদ্দিন বড়ো হয়ে যেন দানেশমন্দ ইমাম কী উজির হতে পারে। ইন্‌শাল্লা। তার জন্য আরও তালিম চাই। এই সিস্তানে সেরকম মাদ্রাসা কোথায়! যেতে হবে সেই বলক্ বা সমরখন্দ। কিন্তু সইফুকে দূরে পাঠাতেও মন চায় না আম্মির। তার আগে চার চারটে লেড়কা লেড়কি হয়েছিল, কেউ পাঁচ সাল বাঁচেনি। সবই খোদাতাল্লার মরজি। বলে খোদা চাইলে সব সম্ভব, এখানেই সইফুর ভবিষ্যৎ খুলে যেতে পারে। আব্বু তর্ক করেও তাকে বোঝাতে পারে না।

আম্মার কাছে কোলের ছেলে হলেও এগারো সাল তো কম উমর নয়। আব্বু তাকে কাছে বসিয়ে বলল, 'বেটা গেহু পেষার কল, জমিনবাগিচা এসবেরই তুই মালিক হবি। এখন থেকে দেখাশুনা

করতে শেখ।' বাধ্য ছেলে বাপের কথা শুনে কামকাজ শিখছে। বাকি সময় ইচ্ছে মতো গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়। অবশ্য যাওয়ার জায়গা বিশেষ নেই অব শিরিনে। সেদিন সুরজ পশ্চিমে ঢলছে। আবার সেই পাগলা সোহরাব তাকে পাকড়ে ফেলে। গাঁ সুদ্ধু ছেলেপুলের নানা সোহরাব দেখতে একদম বুচ্চা, উমর কত কেউ জানে না। নিজে বলে সও সাল। আসলে নাকি তার অর্ধেক। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। এ গাঁয়ে তার চোদ্দ পুরুষের বাস। সোহরাবকে জনম দিয়ে তার আম্মি মারা যায়। মানুষ করে দাদি। বাপ আবার শাদি করে, তার ক'টা সৎ ভাই-বোনও আছে, আছে চাচা খালা সব। কারও কাছে সে বরাবর থাকেনি। কোনোদিন খালার বাড়িতে দুটো রুটি, শালগমের ঝোল চেয়ে খায়, কোনোদিন চাচা তাকে ডেকে ক'টা বাদাম আর এক বাটি দই দিত। ক্রমে তার বয়স হয়ে গেল। এখন চাচা খালার নাতিপুতিরা খেতেটেতে দেয়, বেমার হলে দাওয়াই। শীত গ্রীষ্ম তার রুটিনে ভেদাভেদ নেই। পরনে সেই টুটাফাটা লম্বা জোব্বা আর ছেঁড়া একটা ফেজ টুপি। ঠাণ্ডায় একটা কাংড়িতে আগুন নিয়ে জোব্বার মধ্যে রেখে বসে থাকে। সারাক্ষণ নিজের মনে বকবক করে যায়। কোনো মাথামুণ্ডু নেই।

অথচ বাপ ছিল মুয়াজ্জিন, আজান হাঁকত পাঁচ দফা। সোহরাবকে মক্তবে ভর্তি করা হয়েছিল। আট সাল বয়সে দাদিও মারা গেল। সেই থেকে কেমন হয়ে গেল। কারও সঙ্গে বিশেষ বাতচিত করত না। চুপচাপ একলা বসে থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আব্বা যত বোঝায়, 'আরে ইনসান হতে হবে। বিলকুল আনপঢ় হলে চলে! মুসলমান বলে কথা যা মক্তবে বস।' কিন্তু কোরান মুখস্ত করায় তার মন নেই, মন নেই কোনোরকম তালিমে। আর পাঁচটা লেড়কার সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াতে যায় না। যখন পুরো জওয়ান হলো, মাথাটা পুরো বিগড়োল। নিজের মনে কী সব বিড় বিড় করত। আস্তে আস্তে বয়স বাড়ল, চুল সফেদ হলো। তখন আরও বাড়ল তার পাগলামি। জনে জনে ডেকে জিগ্যেস কর, 'শুনতে পাচ্ছ? ওই যে দূর থেকে কান্নার আওয়াজ? কোনো আওরত কাঁদছে। শোন শোন বলছে আহুরা ম্যাজ্‌দ আহুরা ম্যাজ্‌দ, বাঁচাও বাঁচাও।'

ছেলেবেলায় এ কিস্সা সইফুও শুনেছে। আব্বুকে প্রশ্ন করেছে, আহুরা ম্যাজ্‌দ মানে কী? প্রচণ্ড রাগ করে গর্জে উঠেছে আব্বু, 'খবরদার ফের যদি ওসব খারাপ বাত্ মুখে আনিস তো জিভ ছিঁড়ে ফেলব। ও নাম নেওয়াও গুনাহ। ব্যাটা মুরতাদ, আল্লার গজবে পড়বে। কবে সরকারের কানে পৌঁছবে, গর্দান যাবে। হারামখোরের বাত শুনলে আর পাঁচটা মোমিনও বরবাদ হবে।' সইফু তার সঙ্গীসাথীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, ব্যাপারটা কী রে? তাদেরও এক অভিজ্ঞতা। বড়োরা আহুরা ম্যাজ্‌দ শুনলেই ক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

আজ বাড়ি ফেরার পথে দেখে চারিদিকে কেউ নেই, মওসমও ফুরফুরে, না গরম না শীত। বিকেলের নরম আলোয় সোহরাব নানাকে অতটা বিকট লাগছে না। 'এই হাফিজ, এদিকে আয়, শুন, বাত শুন।' অন্যদিন কামকাজ বা পড়ালিখার বাহানা তুলে অন্য ছেলেদের মতো সইফুও নানার খপ্পর থেকে পালিয়ে যায়। আজ কী মনে হলো, বলল, 'কী বাত? তুমি সারাক্ষণ কী সব বল?'

'শুনতে পাস কোনো আওরত কাঁদছে? না, তুই কী করে শুনবি?' কোটরাগত কালচে নীল চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে ওঠে। তার রাতের আস্তানা কতগুলো আধভাঙা পাথরের ঢিবির মধ্যে। তার ফোকরে অর্ধেক সেঁদিয়ে যায়। 'যা যা তোর সঙ্গে কোনো বাতচিত নেই। তোরা আরবরাই তো ইরানিদের সর্বনাশ করেছিস।'

সইফু একেবারে হতবাক। হ্যাঁ, তারা সৈয়দ, আব্বু আরবিতে পণ্ডিত, সকলে ইজ্জত করে। কিন্তু সোহরাব নানা বা গাঁয়ের আর পাঁচজনের মতো তারাও তো ফারসিতে সর্বদা কথা বলে। তাহলে তারা আরব হয় কী করে? 'না, না, আমিও তো ইরানি, তোমার মতো।' আধপাকা চুল দাড়ি জোরে জোরে নাড়ে সোহরাব। 'ঝুট, ঝুট। যা তোর নানা-নানি দাদা-দাদিকে পুছতাছ করে জান গে তোরা কী। ব্যাটা সৈয়দের আওলাদ, তুই আবার ইরানি হলি কবে রে? যা যা ভাগ, ভাগ বলছি।'

হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে সোহরাব। এক দৌড় দেয় সইফু। পাগলা কী কখন করে বসে। কাউকে ঘটনাটা বলতে পারে না। সোহরাব নানার সঙ্গে বাতচিত একদম হারাম, আব্বাজান আম্মিজান পইপই করে বলেছেন। তাহলে কাকে জিজ্ঞেস করবে! তার দাদা দাদির তো কবে ইন্তেকাল হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, নানি আছে, মামুদের সঙ্গে থাকে। সিস্তানেই, হামুন দরিয়ার ধারে। নানি নিশ্চয় জানবে। ফির সাল এক বার ওখানে এক মাহিনা থাকে সইফু। সেখানেও তার খুব আদর। পরের বার মামুর বাড়ি গেলে জিজ্ঞেস করবে।

বড়ো মামু আসে আব্বা আম্মির সঙ্গে দেখা করতে। গপসপ করে, মোঙ্গল তাতার তুর্কিদের গালি দেয়। অসভ্যদের দাপটে ইরানিদের দুরবস্থার জন্য হাহুতাশ করে। আব্বু বলে 'তোমরা ইরানি বলে খুব অহংকার কর, অথচ ইরানি একটা জাত নয়, তুর্কি মোঙ্গলরা তবু তো এক একটা জাত। যেমন আরব একটা জাত। তোমরা তো পাঁচমেশালি খিচুড়ি। কবে কোন কালে গ্রিক বীর পারসিউসের আওলাদ পেরেস-এর থেকে পরস নামে এক জাত হয়েছিল, তাদের রাজা সাইরাস আকিমিদ বংশের পত্তন করেন। তাই দুনিয়া আমাদের পারসি বলে, এ মুলুককে বলে পারস্য। অথচ তোমরা নিজেদের বল ইরানি।'

‘দুলাভাই, আমাদের বুলি পারিস ’ ফারসি, জাতে আমরা বরাবর ইরানি।’ আম্মি হেসে বলে বকওয়াস বন্ধ কর, খানা তৈয়ার। পরদিন তার সঙ্গে সইফু মামাবাড়ি যায়।

।। দুই।।

তখন শীত কাল শেষ হতে চলেছে। রাতে এখনও রেজাই কম্বল লাগে। নানা-নানির বিছানায় তার শোওয়া চাই। নানা তো নেই, তার জায়গাটা খালি। নানির গায়ের ওমে কী আরাম। প্রতি রাতে নানি কত কিস্সা বলে, শুনতে শুনতে কখন তার চোখ বুজে যায়, নিদ আসে ঘুমের মধ্যে কোনটা কিস্সা কোনটা খোয়াব আলাদা থাকে না, মিলেমিশে যায়। একরাতে মামু ঘরে নেই, হেরাটে গেছে কারবারের কাজে। মইনুদ্দিন নানিকে জিজ্ঞাসা করে, ‘আচ্ছা নানি, তুমি আহুরা ম্যাজ্‌দ-এর নাম শুনেছো?’

চমকে ওঠে নানি। ‘কী, কী বললি? আহুরা ম্যাজ্‌দ! কোথায় কার কাছে এ নাম শুনলি?’

একটু ভড়কে যায় সইফু। এই রে, নানিও বুঝি আব্বু আম্মির মতো রাগ করবে, বকবে। আস্তে আস্তে সোহরাব পাগলার কথা বলে। নানি চুপ করে থাকে। বেগতিক দেখে কথাটা ঘোরাতে অন্য প্রসঙ্গে চলে যায় সইফু।

‘ঠাণ্ডা চলে যাচ্ছে, কী সুন্দর নীল আশমান এখন, সারাদিন ধুপ।’

এবার নানি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বলে, ‘অনেক অনেক কাল আগে এসময় উৎসব হতো। আমিও দেখিনি। আমার নানি তার নানি, তার নানির কাছ থেকে শুনেছে। তখন আমাদের আলাদা ইমান ছিল। অন্য খোদা ছিল। আমরা নমাজ পড়তাম না, আল্লার নাম নিতাম না। হ্যাঁ, সচ্। কাউকে বলিস না। শুধু আমাদের গাঁয়ে নয়, সারা ইরানশহর, ইরানজমিন জুড়ে ছিল অন্য খোদা। তারই নাম আহুরা ম্যাজ্‌দ, প্রভু শ্রেষ্ঠ মেধা, তিনি আলোক, তিনি মঙ্গল, যা কিছুর শুভ সব। তাঁর রসুল ছিলেন জরাথুস্ত্র। কোরানের মতো তাঁর সব কথা লেখা ছিল কিতাবে, তাকে বলত জেন্দ আভেস্তা।’

সইফুদ্দিন স্তম্ভিত, বলে ওঠে, ‘মাশআল্লা! সে কী করে হবে! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো। আল্লা ছাড়া আর কোনো খোদা নেই। নবি হজরত মহম্মদ তাঁর একমাত্র রসুল।’

‘আরে, দুনিয়ার উমর তো হজরত মহম্মদের চেয়ে ঢের ঢের বেশি। তাঁর জন্মের আগে হাজার বছর ধরে এক বিশাল ইরানি সাম্রাজ্য ছিল, সারা দুনিয়ায় মশুর, তার কত ইজ্জত কত কীর্তি। আমাদের নবি জরাথুস্ত্রকে দেখা দিয়েছিলেন প্রভু শ্রেষ্ঠ মেধা। তিনি যা বলেছিলেন সব লেখা হয়েছিল। তখনকার জবান পহ্লবিতে, নিজস্ব হরফে। মসজিদ আমাদের এবাদতখানা ছিল না, ছিল মন্দির। সেখানে হরবখত আগ্ জ্বলত। আগ হচ্ছে পুণ্য, পবিত্রতার প্রতীক, মন্দিরকে বলত আগিয়ারি। এই সিস্তান ছিল জরাথুস্ত্রীদের তীর্থ। তাকে বলত সেইয়ানা। আরবদের দেওয়া নাম সিস্তান। আমাদের ধরমে কোনো ভয়ডর ছিল না, মারামারি ছিল না, ছিল আনন্দ, পেয়ার। সৎবাক্য সৎকর্ম সৎ চিন্তা। ব্যস, এই হলেই জিন্দগি সুখশান্তির। হর মরশুমে ফসল বোনা, কাটা, ঘরে তোলা, সব কিছু নিয়ে আমাদের ‘গাহানবার’ বা উৎসব হতো। কত শাহেনশাহ এ ধরম পালন করে গেছেন সাইরাল দারিউস জেরেক্সেস। হাজার সাল ধরে পুরা ইরানজমিন ছিল এখান থেকে সেই সমরখন্দ বোখারা পর্যন্ত। সর্বত্র আহুরা ম্যাজ্‌দকে মানত, সক্কলে ছিল জরাথুস্ত্রী। আমরা কত কী কীর্তি হাসিল করেছিলাম। সারা দুনিয়া আমাদের তারিফ করত।’

একেবারে স্তম্ভিত সইফু। বরাবর শুনে আসছে ইসলাম প্রবর্তনের আগের সময় ছিল খুব খারাপ। তাকে বলে জাহিলিয়া, সেটা অন্ধকার যুগ, যার থেকে নবি আমাদের উদ্ধার করেছেন। সেসব কথা সত্যি নয় তা কি হয়! নানিকে জিজ্ঞাসা করে, ‘তারপর কী হলো?’

নানি আবার খানিকক্ষণ চুপ। পরে আস্তে আস্তে বলে, ‘ইরানিদের বদনসিব। আরব মুলুকে নবি হজরত মহম্মদের ওপর ওহি, আল্লার বাণী অবতীর্ণ হলো। তার নাম ইসলাম। আরবরা মুসলমান হয়ে নিজেদের মুলুকের বাইরে অনারবদের দেশে হামলা চালাতে লাগল। প্রথমেই আমাদের সাম্রাজ্য আক্রমণ করল। সে এক ভয়ংকর ইতিহাস। কত জরাথুস্ত্রী খুন হলো তার হিসাব নেই। রিয়াসাত হাতিয়ে নিয়ে সরকার হয়ে বসল আরব মুসলমানরা। জ্বালিয়ে দিল জরুথুস্ত্রী পুঁথিপত্তর। ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল আগিয়ারি। তাতেও শান্তি নেই হানাদারদের। কত রকমের যে অত্যাচার চালালো সব বলাও যাবে না।’

‘না, না। বল আমি জানতে চাই নানি। ইসলাম মানে তো আত্মসমর্পণ, শান্তি। তাহলে মুসলমান হয়ে আরবরা কেন এমন করত?’

‘জানি না রে। আমি তো আরবি জানি না। নমাজ আদা করি তোতা পাখির মতো। তুই তো কোরান মুখস্ত করেছিস! তুই খুঁজে দেখ অমুসলমানদের প্রতি কী আচরণের নির্দেশ আছে।

সইফুদ্দিনের কোরান কণ্ঠস্থ বটে, কিন্তু প্রতিটা সুরা বা আয়াতের অর্থ তার জানা নেই। তবে এটুকু জানে, স্বয়ং নবি কত যুদ্ধ করেছিলেন যারা ওহিতে বিশ্বাস করে না সেই সব অংশীদার কাফেরদের সঙ্গে, ভেঙেছিলেন তাদের মন্দির। জিজ্ঞাসা করে, ‘আরবরা ফতে করলে সবাই তাদের মতো মুসলমান হয়ে গেলেই তো হলো। ব্যস আর কী অসুবিধা?’

‘ইরানিরা তো আরব নয়, তারা কেন চোদ্দপুরুষের ধরম ছাড়বে? না ছাড়লে

তখন তাদের কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায় করত মুসলমানরা। যারা জিজিয়া দিত তাদের আরবরা ভারি হতশ্রদ্ধা করত। আর জিজিয়া না দিলে তো সটান গর্দান। ইরানি মেয়েদের জোর জবরদস্তি করে তুলে নিয়ে যেত। আরবদের রাজত্বে ইরানিদের সরকারি চাকরি মিলত না, মজুর কারিগরেরা কাজ পেত না মুসলমান না হলে। কোনো বিচার ছিল না। হাজার সাল যে মাটিতে তাদের পূর্বপুরুষ হেসেখেলে বাস করেছে, সেই বেহেস্ত ইরানিদের কাছে দোজখ হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে তারা আহুরা ম্যাজ্‌দ আর জরাথুস্ত্রকে ছেড়ে আরবদের আল্লা আর হজরত মহম্মদকে তাঁর রসুল হিসাবে মানল। হলো মুসলমান। অনেক পুরোহিত বড়োলোক ইরানি ধরম বাঁচাবার জন্য মুলুক ছেড়ে বাইরে পালিয়ে গেল। বেশিরভাগ গেল হিন্দ-এ, সেখানে গিয়ে ধরম বাঁচাল।'

'আমার বিলকুল তাজ্জব লাগছে। এ সব কেউ জানে না! আমি তো কারো কাছে ইরানিদের আলাদা ধরম, জরাথুস্ত্র, আরব হামলা, জিজিয়া করের কথা শুনিনি!'

নানি আস্তে আস্তে বলে, 'আমাদের ভুলতে বাধ্য করা হয়, যাতে আমরা কী ছিলাম যেন জানতে না পারি। জানলে পাছে আবার যদি ধরমে ফিরে যেতে কোশিশ করি।'

'তুমি কী করে জানলে?'

'আমার নানির নানির নানি ছিল এমনই এক জরাথুস্ত্রী আওরত, যাকে আরব হানাদার তুলে নিয়ে গিয়েছিল, জবরদস্তি করে কলমা পড়িয়ে নিকাহ করেছিল। আওরতের পেটে একবার বাচ্চা এসে গেলে তার বাচ্চার বাপের কাছ থেকে আর রেহাই নেই। রেহাই নেই দুশমনের ধরম থেকে। এভাবেই কত ইরানি আওরত মুসলমান হতে বাধ্য হলো। আর নিজের ধরমের সন্তানের জনম দিতে পারল না। জরাথুস্ত্রীদের সংখ্যা কমতে লাগল। নানি খুব কাঁদত, লুকিয়ে লুকিয়ে একা একা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে যেন কেউ শুনতে না পায়। প্রভু শ্রেষ্ঠ মেধা এ কোন শয়তান আহ্‌রিমান, কোন অন্ধকারের অশুভের, দানবের পায়ে আমাদের সমর্পণ করলে? কোথায় তোমার ফেরেস্তারা? নানি তার লেড়কিকে বলেছে, সে তার লেড়কিকে। এইভাবে সও সও সাল ধরে আমরা ইরানি আওরতরা জানি।'

'তুমি তোমার লেড়কিকে বলেছো? আম্মিকে?'

'বলেছি। তখন ও ছোটো। তারপর ওর শাদি হয় সৈয়দের সঙ্গে। তাই ও ভুলে থাকে। তাছাড়া ওর তো লেড়কি নেই। কাকেই বা বলবে। এ পরিবারে আমার সঙ্গে সঙ্গে আহুরা ম্যাজ্‌দ-এর স্মৃতিও হারিয়ে যাবে। মরেও আমার শান্তি হবে না।'

চুপ করে থাকে সইফুদ্দিন। মনটা বড়ো খারাপ হয়ে যায়। সে জানে আল্লা একমাত্র উপাস্য, হজরত মহম্মদ তার একমাত্র রসুল। যারা অবিশ্বাসী তাদের সঙ্গে লড়াই করে বিশ্বাসী করতে হয়। জরাথুস্ত্রীদের তো ইসলাম নিতেই হতো। আবার চায় তার নানি যেন শান্তি পায়। হঠাৎ একটা ভাবনা তার মাথায় আসে। নানি তো একলা নয়। তার মতো অনেক নানি-দাদি মুসলমান হয়েও মনে মনে আহুরা ম্যাজ্‌দ-এর কথা ভাবে। ভাবে সেই হাজার বছর আনন্দে মাথা উঁচু করে বাঁচার কথা, যখন আরব তুর্কিরা তাদের ওপর রাজ করত না। পাগলা সোহরাব আদতে পাগলা নয়। কে জানে কত সোহরাব এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে। কত ইরানি মনে মনে আহুরা ম্যাজ্‌দ-এর নাম করে, দুঃখ করে সেই খোলামেলা আনন্দের জিন্দগি হারিয়ে গেল বলে। মানে মুসলমান হয়েও তারা এত সাল ধরে ইসলামে পুরা খুশ হতে পারেনি। এ তো ভয়ংকর ব্যাপার। সে রাতে ভালো নিদ হয় না সইফুর। তার আর মন লাগে না নানির আদর যত্নে।

মামাবাড়ি গিয়েছিল এক বালক। ফিরে এল এক সাবালক। এক রাতে যেন সে লায়েক হয়ে গেছে। কাউকে সইফুদ্দিন এসব কথা বলতে পারে না। আব্বুর সঙ্গে যথারীতি কামকাজ করে, বাগিচায় আগাছা সাফ করে, মাটি খোঁড়ে, নারাঙ্গি খেজুর পাকলে পেড়ে জড়ো করে। আঙুরের মতো ফল আবার শুখাতে হয়। কিশমিশ হবে। বাকি সময় কোরান নিয়ে বসে। প্রতিটি আয়াত প্রতিটি সুরা বারবার পড়ে। না, মুখস্ত তো তার হয়েই আছে। এখন নিঃশব্দে পড়ে। প্রতিটি কথার অর্থ, তার সব রকম উপলব্ধি কী হতে পারে। আম্মি মাঝে মাঝে বলেন, 'একটু বাইরে বেড়িয়ে আয় না। সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে পাঁচটা গপসপ কর গিয়ে। সারাক্ষণ কাজ আর পড়া নিয়ে থাকলে আদমির দিমাগ ঠিক থাকে!' মৃদু হাসে সইফুদ্দিন। 'আমার দিমাগ বিলকুল ঠিক আছে, থাকবে। তুমি ফিকর করো না।'

শুধু আম্মি নয়, গাঁয়ের পাঁচজন বয়স্করাও ওই এক বাত বলে। বাপ ঠিক করে ছেলে যোল সাল হলেই শাদিনিকাহ দিয়ে দেবে। ঘরে একটা ছোট্ট খুবসুরত বিবি থাকলে দেখি কত কিতাব মুখে করে থাকতে পারে! কিন্তু তকদিরে কী লেখা কে বলতে পারে। সইফুর যোলো সাল হতে না হতে তল্লাট জুড়ে কী একটা অজানা বেমারি লাগল। গাঁয়ের অনেক মানুষের সঙ্গে সেই মড়কে আব্বা আম্মা দুজনেরই ইন্তেকাল হয়ে গেল।

।। তিন।।

আল্লার কী মরজি, সইফুর কিচ্ছু হলো না। কেন হলো না? তবে কী আল্লা চান না এই জমিজিরেত পেষাই কলের দুনিয়াদারিতে জিন্দগি না কাটিয়ে সে অন্য কিছু করুক। যা জানতে চাইছে, কোরানের নিগুঢ় অর্থ, তার তালাশ করুক। অবস্থা স্বাভাবিক হলে শহরের

এক কারবারিকে তার বাগবাগিচা পেযাই কল সব বেচে দেয়। টাকাকড়ি পরনের লম্বা ঢিলা পোশাকে সেলাই করে লুকিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। আব্বুর যত্ন করে রাখা ক'পুরুষের পুরনো চামড়ায় লেখা বিশাল কোরান সঙ্গে বইতে পারল না বলে বড়ো আফশোষ। দিয়ে দিল মক্তবে। সঙ্গে খালি একটা লাঠি, আর এক প্রস্থ পোশাক, একটা বদনা আর হালকা রেজাই। মড়কে পাগলা সোহরাব খতম হয়নি। সে আরও একটা জিগির বানিয়েছে, 'দেখ ইরানি দেখ, আল্লার পাঠানো আরব তাতারদের রাজত্বে কত ভালো আছিস।' তার ফোকরটা পাশ দিয়ে যেতে যেতে সঙ্কল্প করে, আর কাউকে সোহরাব নানার মতো পাগলা হতে দেব না। ইসলাম মানে সমর্পণ, সম্পূর্ণ সমর্পণ। করম ধরম শাদিনিকাহ ঘরগিরস্থি সব ইসলামের বিধান অনুযায়ী শাসিত হবে, কোনো অতীত থাকবে না, থাকবে না অন্য কোনো জীবনের স্মৃতি। থাকবে না ভিন্ন জীবনের কোনো স্বপ্ন। তার জন্য সইফুকে আরও গভীর ভাবে কোরান বুঝতে হবে।

কাউকে কিছু না বলে তার যাত্রা শুরু। প্রথমে পৌঁছয় বলখ্, হিন্দ-এর লোকেরা বলে বাহ্নিক। সেখান থেকে সমরখন্দ। দু-জায়গাতেই তার স্থান হয় মাদ্রাসায়। বড়ো সুবিধা খরচ নেই। এতদিন কোরান মুখস্থ করেছে। এখন তার প্রতিটা সুরা প্রত্যেকটি রুকু, প্রত্যেকটি আয়াতের ব্যাখ্যা শোনে। পড়ে হাদিস, ফিকহা। মুসলিম রাষ্ট্র দেশ সমাজ পরিবার সব একসূত্রে গাঁথা, ইসলাম ধর্মে। শেখে রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতি, ভালো করে আয়ত্ত করে ইসলামের আইনকানুন। যত শেখে তত বাড়ে তার অতৃপ্তি। না, কোনো আয়াত অবিশ্বাসের প্রশ্নই ওঠেনি। এ সবই 'ওহি' আল্লার প্রেরিত ফেরেস্তা জিব্রাইলের মারফত স্বয়ং নবির কাছ থেকে প্রাপ্ত। তার শুধু মনে হয়, আরও গভীর কোনো অর্থ আছে, যা ব্যাখ্যা শুনছে সেটাই সব নয়। কিন্তু সেটা কী!

আবার বেরিয়ে পড়ে সইফুদ্দিন। সেটা ইসলামের স্বর্ণযুগ। চারিদিকে উলেমা পণ্ডিত জ্ঞানী। দানেশমন্দ ক'জনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় সইফুদ্দিনের। দুনিয়ার মানুষ কত রকম কী বিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু একজন নবি আর কিতাব না হলে তা গ্রাহ্য নয়। তাঁদের পায়ের তলায় বসে সে অনেক শেখে। নবি হজরত মহম্মদের আগে দুনিয়ায় আরও দুজন নবি জন্মেছিলেন, মুসা আর ইসা। আরবের কাছাকাছি সব দেশে। তাঁদের বাণীও কিতাবে লেখা। তাই ইহুদি আর ইসাহিকে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু আহুরা ম্যাজ্‌দ-এর নাম সইফুদ্দিন এঁদের মুখেও শুনল না। অথচ জরাথুস্ত্র তো পহেলা নবি, তাঁর বাণীরও তো কিতাব আছে। তাহলে তাঁকে কবুল করা হয় না কেন? একদম উপরওয়ালার কাছে যাবে জানতে।

তখন খিলাফত বাগদাদে। কী বিরাট শহর। সইফুর তো চোখ ধেঁধে গেল। সবচেয়ে তার মন কাড়ল সেখানকার বিশাল জ্ঞানভবন। একেবার তাজ্জব। খলিফার মেহমান হয়ে কত কিসিমের জ্ঞানীগুণী সেখানে সাল সাল বাস করে কত ভাষার পুরানা সব কিতাব তরজমা করে যাচ্ছেন, গ্রিক সংস্কৃত সিরিয়ান। গণিত জ্যোতির্বিদ্যা ভূগোল জ্যামিতি দর্শন চিকিৎসাশাস্ত্র— আরও কত কী? আশ্চর্য ব্যাপার, এই ভাণ্ডার যাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন সেসব প্রতিভারা ছিলেন মূর্তি পূজারি, বহু দেবদেবীর উপাসক। কেউ মুসলমান খ্রিস্টানদের মতো মূর্তিহীন একেশ্বরে বিশ্বাস রাখতেন না। তাহলে প্রাক ইসলাম যুগকে অন্ধকার যুগ বলি কেন? কেন অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা? তাদেরই অর্জিত জ্ঞান আমরা এত মূল্যবান মনে করি যে আজ খলিফা এই বিরাট আয়োজন করে রেখেছেন। শুধু এখানে নয়, সইফু শোনে অন্যান্য আরব শাসকরাও কাফেরদের কিতাব তরজমা করিয়ে যত্ন করে রাখেন। যেমন করা হয়েছে আল্ আন্দালুসে কর্ডোবায়। তাহলে আমরা জেহাদ হেঁকে মুজাহিদ হয়ে যাদের ধ্বংস করি আবার তাদের সৃষ্টি নিজেরা গ্রহণ করে লাভ করি জ্ঞান। এটা কী চুরি রাহাজানির মতো গুনাহ্ নয়?

মাথাটা গোলমাল লাগে সইফুদ্দিনের। কী করে এই তরজমা আন্দোলন হলো অনেককে জিজ্ঞাসা করে শেষে জানতে পারে এর মূল হচ্ছে ইরানিরা। জরাথুস্ত্রীদের আমলে সম্রাট আসুরবানিপাল গ্রিক সংস্কৃত ভাষায় লেখা অনেক জ্ঞানবিজ্ঞানের বই ফারসিতে অনুবাদ করান। আরবরা দখল নিয়ে সবাইকে মুসলমান করলে মুসলিম ইরানিরাই নয়া শাসকদের এই সব কিতাব আরবিতে তরজমা করে দিতে থাকে। এইভাবে শুরু। তারপর ইরানজমিনের উত্তরপূর্ব কোণে খাওয়ারাজেমে পুরো প্লাবন। মুসলিম পণ্ডিত মানেই বহুভাষাবিদ ইরানি।

অথচ এখানে আহুরা ম্যাজ্‌দ-এর নাম শোনে না সইফুদ্দিন। শোনে না জরাথুস্ত্রী কোনো জ্ঞানীর নাম। তার কাছে দুনিয়াটা যেন অর্থহীন। দিনের পর দিন তার নিদ হয় না। আজান শুনে নমাজ আদায়ে মন লাগে না। তার শরীর শুকিয়ে যায়, অর্ধেক দিন খাওয়া নেই।

এমন সময় এক ইরানি তরজমাকারী তাকে একটা কিতাবের কথা বলে। 'দার্শনিকদের অনৈক্য'। লেখক : আল্ গাজালি, বিশাল পণ্ডিত। বলা বাহুল্য, ইরানি। অনেক কষ্ট করে পড়ে। ভাগ্যিস। আহা মহাজ্ঞানী এই গাজালি। কেমন চমৎকার দেখিয়েছেন ও সব প্লেটো অ্যারিস্টটল যুক্তিবাদ সব তুচ্ছ। আসল হলো অতীন্দ্রীয় উপলব্ধি। দিল্ হচ্ছে সব, দিমাগ কিচ্ছু নয়। আল্লার প্রেমে আত্মবিসর্জনের মরমিয়া অনুভূতি। সুফির সাধনা। নবজন্ম হলো সইফুদ্দিনের। কিতাব পড়ালিখা তার

দরকার নেই। তার দরকার একজন মুরশিদ। যাঁর কাছে সে দীক্ষা নিয়ে হবে মুরিদ। কোথায় পাব তারে!

ফিরে আসে দেশের দিকে। পথে হেরাটে এসে শোনে সও মাইল দূরে চিসতি শহরে মস্ত খান্‌কা, অনেক সুফি সেখানে সাধনা করে। সিরিয়ার আবু ইশাক শামি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সুফি আশ্রমে তাঁর অষ্টম উত্তরাধিকারী মইনুদ্দিন হাসান এখন মুরশিদ, যে মইনুদ্দিন ন' সাল উমরে কোরান মুখস্থ করে মুসলিম দুনিয়ার কত পণ্ডিদের সঙ্গে ওঠাবসা করেছেন। তাঁর অনেক চেলা। সইফু তাঁর চরণে প্রণত। তিনি দীক্ষা দেন। চার দফা মুখে আল্লার নাম, মনে মনে আল্লার নাম, ধ্যান, ৪০ দিন একা নির্জনে সাধনা। আত্মাকে উপলব্ধি। হলো সুফি। মহাজ্ঞানী হাজালি ঠিকই বলেছেন, কাফেরদের অনুসরণে বিজ্ঞান দর্শন পড়ে যুক্তির ভিত্তিতে বহির্জগতকে পর্যবেক্ষণ করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা অর্থহীন। ইসলাম মানে নিঃশর্ত প্রশ্নহীন আত্মসমর্পণ। বিশ্বাস, বিশ্বাসই সব। তর্কের অতীত মরমিয়া অনুভূতি। তিনি এও বলেছেন, অবিশ্বাসীদের বিশ্বাসী করার মহান ব্রত সুফিদের মারফতই ইসলাম তামাম দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

কিন্তু কী করে? বাগদাদে কয়েকজন ইশাহির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তাদের সঙ্গে বাতচিত করে সইফুদ্দিন জেনেছে ইশাহিদের এক বড়া ইমাম আছেন, রোমে থাকেন। তাকে পোপ নামে সব ইসাহি মানে। তাঁর ক্ষমতা ধনসম্পত্তি সব বিলকুল এক সুলতানের মতো। তিনি ইশাহি ধরম প্রচার করতে মুরিদদের চারিদিকে পাঠান। তারা শাদিনিকাহ করে না, সারা জীবন ধরমের কাজ করে। এদের বলে মিশনারি। এদের কায়দা খুব সোজা। কাফেরদের রাজ্যে গিয়ে তারা সিধা রাজার সঙ্গে দেখা করে ইশাহি ধরমের মাহাত্ম্য বোঝায় এবং রাজারানী ইশাহি হলে খোদ পোপ তাদের ইনাম দেবেন প্রতিশ্রুতি দেয়। রাজা ইশাহি হয়ে ফরমান জারি করেন প্রজাদের ইশাহি হতে। ব্যস, কেল্লা ফতে। ওমনি সেই রাজাকে পোপ সন্ত ঘোষণা করেন। একটা পুরো দেশ ইশাহি হয়ে যায়। জিজিয়া কর আদায়, আওরতদের তুলে নিয়ে শাদি, এসব ঝঞ্ঝাট করতেই হয় না। রাজার ধরম প্রজার ধরম হয়ে যায়।

কিন্তু মুসলমানদের তো পোপ নেই, কে পয়সা দিয়ে মিশনারদের মতো সুফিদের পাঠাবে দারুল হারাবকে দারুল ইসলাম বানাতে? বাগদাদে খলিফা তো আছেন তাঁর তরজমার শখ নিয়ে। কালি খাওয়ারাজেম নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা। সেখানকার ইরানিরা জ্ঞানীগুণী হয়ে ভারী নিজেদের কেউকেটা মনে করে। আরব আব্বাসিদ খলিফাকে আজকাল রেয়াতই করে না। খলিফার তাই চিন্তা কী করে খাওয়ারজেমকে শায়েস্তা করবেন। তাহলে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে জং লড়াই ছাড়া গতি নেই? কিন্তু লড়াইয়ের শেষে তো ওই নানির মতো, সোহরাবের মতো মুসলমান হবে, যারা শত শত বছরেও ইসলামকে মনে মনে পুরো মেনে নেয়নি।

।। চার।।

খান্‌কার আর পাঁচজন সুফিকে কিছু বলে না সইফু। কাছে মাদ্রাসার দুচার জন শিক্ষকদের আলাপ হয়েছিল তাদের সঙ্গে বাজারে শরবতখানায় আলোচনা করে। তাদেরও ভাবনাচিন্তা তারই মতো। তাদের মধ্যে ইরানি ফিরোজ বড়ো চালাকচতুর। তাকে পরামর্শ দিল, 'তুমি ঘুর্ চলে যাও, সুলতানের সঙ্গে দেখা কর, উনি কাফেরদের মুলুক দখল করে ইসলামের গৌরব জারি করার কাজ নিয়েছেন। ইসলাম প্রচারের কামিয়াব আদমি চান। হ্যাঁ, এসব বাত কাউকে বলো না। যাও চলে যাও।'

ইতস্তত করে সইফু। কোনোদিন আমির ওমরাহ ফৌজি জাতীয় মানুষজনের সঙ্গে তার জানপহচান বাতচিত নেই। কীভাবে হঠাৎ খোদ সুলতানের কাছে যাবে। 'আরে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আমি একটা চিঠা দিয়ে দিচ্ছি, সোজা চলে যাও। পয়সাকড়ি লাগবে তো? নাও, রাখ। আরে তুমি আমার ছোটো ভাইয়ের মতো। যাও যাও দেরি কর না। অনেকটা রাস্তা। শুনছি সুলতান আবার অভিযানে যাবেন। কবে বেরিয়ে পড়বেন, ধরতে পারবে না।'

অতঃপর সইফুদ্দিন পৌঁছায় রাজধানীতে, সুলতানের কিল্লায়। চারদিকে ফৌজি হাতিয়ারওলা ইয়া ইয়া মরদ দেখে ভয় ভয় করে। ফটকের সামনে যেতেই তাজ্জব, সশস্ত্র রক্ষী তাকে দেখে ভারী নরম সুরে বলে, আপনি সুফি? কোথাকার খান্‌কা? চিসতি? সুলতানের হুকুম আছে সুফি মাত্রেই সিপাহ্‌সলারের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে। চলুন।'

সইফু যেন স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে চলেছে। একটা কামরায় আবার এক ফৌজি। এর বয়স একটু বেশি, পোশাক আরও জমকালো। মুখখানা কেমন চ্যাপ্টা, কুতকুতে চোখ, নাকটা ইরানিদের মতো চোখা নয়। সইফু সালাম করে চিঠাটা দেয়। মাথা নেড়ে বলেন, 'হুম! আল্লাহর বাণী কাফেরদের কাছে পৌঁছে দিতে চান? বহোত খুব। সুলতান এমন আদমিরই তালাশ করছেন। বন্দোবস্ত সব আমরা করব। আল্লা তো আর সুফিদের ডানা দেননি যে সও সও মাইল উড়ে চলে যাবেন। এমন পেট দেননি দুবেলা খানা ছাড়া বাঁচতে পারবেন। আমাদের মারফতই তিনি কাজ করেন। শুনেছে নিশ্চয় হুজুর আল্ হিন্দে হামলা চালাচ্ছেন। আমরা কাফের রাজশক্তিকে খতম করে মুলুক দখল করব। কিন্তু আমআদমি আমাদের মেনে না নিলে দখল নিয়ে লাভ কী? চাষা চাষ করবে, বানিয়া বেওসা চালাবে যে যার

কাজ করলে তবেই না খাজনা মিলবে, রাজ কায়েম হবে! আপনাদের কাজ হবে আমআদমিকে ইসলামের শাসন মানানো। যেমন করে পারেন তাদের বশ করবেন। তার জন্য পহেলা কাম হিন্দভি বুলি শেখা। আপনি জাতে ইরানি তো? তাহলে শক্ত হবে না। ফার্সির সঙ্গে অনেক মিল আছে।'

সুফিদের দর্শন, সব আদমিকে পেয়ার আল্লার প্রতি প্রেম ইত্যাদি সইফু বলতে গিয়েছিল। সিপাহ্সলার বাধা দেন। 'ও সব জানি। তবে আপনার নিজের একটা বাড়তি বড়ো দায়িত্ব থাকবে। যেখানে পাঠানো হবে সেখানকার মানুষজনেরা তাদের রাজা সম্বন্ধে কী বলছে, রাজার স্বভাবচরিত্র কাজ কর্ম অভ্যাস, তার ফৌজই বা কত বড়ো, ক'টা উট, ক'টা হাতি। ওই হাতি হিন্দের খতরনাক জানওয়ার। আমাদের মুসিব্বতে ফেলে। এসব খবর আমাদের জানা জরুরি। নইলে হামলা করে ফতে করতে পারব না। এমনভাবে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে আপন লোক হতে হবে যেন কেউ বুঝতে না পারে আপনি খবর জানতে চাইছেন।'

সইফু স্তম্ভিত, নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। এসব কী! সে তো এতকাল শুধু পড়ালিখা করে এসেছে, আর করেছে আল্লার ধ্যান। বেশ রাগই হয়ে যায়। বলে ওঠে, 'এতো জাসুসি!

গুপ্তচরের কাজ। আমি সুফি, আল্লার সেবক হয়ে কী করে— কথা শেষ হয় না। সিপাহ্সলার বলেন, 'এটাও তো আল্লারই কাজ। সবই তাঁর জন্য। স্বয়ং নবি কী কী করতেন মনে নেই? বেওসা থেকে হাতিয়ার হাতে লড়াই। আর লড়াই মানেই পহেলে খোঁজখবর, তবে হামলা। নইলে কামিয়াব হলেন কী করে। হ্যাঁ, আপনার এসব কায়দা জানা নেই। তার জন্য তালিমের বন্দোবস্ত করা আছে, কী কী নজর করবেন, কেমন করে খবর পাঠাবেন সব শিখিয়ে দেওয়া হবে। শুনুন, ক'টা জিনিস খেয়াল করবেন। কাফেরদের লড়াই আমাদের চেয়ে কোন কোন বিষয়ে আলাদা। হিন্দ-এর কাফেররা পুরানা কাল থেকে অনেক লড়াই করেছে। জরুর তাদের নিজেদের নিয়ম রীতিনীতি থাকবে। এ খবরটা জরুরি।'

সইফু যেন এক উদ্দাম স্রোতে ভেসে যাচ্ছে, তার নিজের কোনো ক্ষমতা নেই। তবু কোনোক্রমে বলে, 'হুজুর আমি তো মইনুদ্দিন হাসান সাহেবের মুরিদ। আমার চলাফেরা ওঠাবসা ওঁরই হুকুমে। ওঁকে বাদ দিয়ে একলা আমার পক্ষে হিন্দ যাওয়া'— কথা শেষ হওয়ার আগে সিপাহ্সলার বলেন, 'আপনি একা যাবে না। তিনিও যাবেন।'

বিস্ময়াহত সইফু জিজ্ঞাসা না করে পারে না, 'আপনারা কী ওঁকে হিন্দ্ যেতে রাজি করিয়েছেন?'

মৃদু হাসেন সিপাহ্সলার, 'ওঁকে খোদ আল্লা রাজি করাবেন। আপনি এ নিয়ে ভাববেন না। যান, তালিম নিন। হ্যাঁ, আসল কথাই তো বলা হয়নি। হিন্দ্ বিশাল দেশ। আপনারা যাবেন একটা শহরে, অজয়মেরু। রাজা পৃথ্বিরাজ চৌহানের রাজধানী। ওখানেই হিন্দ্-এ ইসলামের খুঁটি গাড়বেন। ব্যস আসুন, খোদা হাফিজ।'

তালিম নিতে গিয়ে সইফু যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল সইফু। এতদিন সে দুনিয়াদারি কিছুই জানত না। সুলতান মহম্মদ ঘোরি নিজে আদতে ইরানি হলেও তাঁর ফৌজে তুর্কিদেরই দাপট, যেমন খোদ সিপাহসলার। আম ফৌজি স্থানীয়, ঘুর, হেরাট, বলখ্ সিস্তান— এসব জায়গার আনপঢ়রা। খানাপিনা দুশমন খতম আর গনিমতের মাল ভোগ ছাড়া আর তাদের কিছুতে মন নেই। এদের জয় হাসিল করার জন্য তাকে কাম করতে হবে। নইলে আল্লার সেবা হবে না। মাথার ওপরে যেন একটা বিশাল বোঝা, যার থেকে তার শয়নে স্বপনে জাগরণে কখনো মুক্তি নেই। হেরাটে ফিরে চিসতিতে গিয়ে দেখে সাজ সাজ রব। মইনুদ্দিনকে আল্লা স্বপ্নে হুকুম দিয়েছেন, 'যাও, হিন্দ-এ, আল্লার বাণী প্রচার কর।' ভয়ে ভয়ে সইফু প্রশ্ন করে— 'হুজুর হিন্দ্ তো বিরাট দেশ। আমরা কোথায় যাচ্ছি?' প্রশান্ত মুখে মুরশিদ জবাব দিলেন, 'অজয়মেরু, রাজা পৃথ্বিরাজের রাজধানী।'

।। পাঁচ।।

আরাবল্লি পার্বতমালায় ঘেরা চারশো সাল পুরানা রাজা অজয়দেবের তৈরি অজয়মেরু নগরীর নামের মানে অপরাজিত পর্বত। সেখানে খান্কা বসেছে, তার মুরশিদ খাজা মইনুদ্দিন হাসান চিসতি। আর অন্য সুফিদের সঙ্গে রয়েছে সইফু। দশ সালের উপর কেটে গেছে। কত লোক এ মুলুকে বাপরে বাপ! সব কাফের! কত কিসিমের ঠাকুর দেবতা, ভজনপূজন লেগেই আছে। বেপরদা আওরতের দল বাইরে কাম কাজ করে, মাথায় তিনচারটা গাগরি পানি ভরে ঘরে নিয়ে যায়। লম্বা পোশাকপরা সুফিদের দেখলে মুচকি হাসে বেশরম বেতমিজের দল। সইফু জানে, অনেক সুফির দেহমন চনমন করছে। তার বরাবর আওরতে নফরত, মরদদের সঙ্গে থাকতেই ভলো লাগে। এত খুবসুরত আওরত, কী সব বাহারি রঙের পোশাক। সইফু তাকাতে পারে না।

কাফেরদের একটা বৈশিষ্ট্য হলো, নিজেরা অনেক দেবদেবী মানে বলে পরদেশি এসে যখন বলে, 'আমরা অন্য এক দেবতার পূজা করি' তারা মারতে ওঠে না। বলে, 'বেশ তো করুন।' আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো, এ মুলুকে এক মরদের বহুত জমিন জায়গা ধনদৌলত পাঁচ-দশটা বিবি, বিশটা বালবাচ্চা থাকলেও কেউ খাতির করে না। কিন্তু একটা আধ নাঙ্গা আদমি যার কিচ্ছু দৌলত নেই, নেই আওরত, বালবাচ্চা, সে যদি নদীর কিনারে কী পাহাড়ের গুহায় একলা বসে ধ্যান করে, তার খাতির দারুণ। আমআদমি, ছেলেবুড়ো মরদ-আওরতও তার পায়ে গিয়ে পড়ে, সে যা বলে, সব তারা শোনে। মইনুদ্দিন সাহেব বলে দিয়েছেন, সুফিদেরও এমন সাধু-সন্ন্যাসীর মতো চালচলন করতে হবে। নইলে হিন্দ্-এ পাত্তা পাবে না। তারা সেই পথই নিয়েছে। যদিও কোরানে প্রত্যেক মুসলমানকে শাদি করে আল্লার বান্দা বালবাচ্চা পয়দা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হিন্দে সুফিরা সে সব বিশেষ মানছে না। শাদি করলেও খুব দরিদ্র খুব সংযতভাবে থাকে, ব্রাহ্মণদের মতো। মানুষজন তাই কাছাকাছি আসে, বাতচিত হয়। যেটা সইফুর খুব দরকার।

তবে মইনুদ্দিন সাহেবের একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে। কেরামত। তারা পৌঁছেই যে গাছপালা ঘেরা জায়গাটি থাকার জন্য বেছেছিল, সেখান থেকে রক্ষীরা তাড়িয়ে দিল। 'ওখানে রাজার উট বাহিনী বিশ্রাম করে।' মইনুদ্দিন বললেন, 'বেশ, রাজার উটরা ওখানে বসে থাক।' পরদিন উটচালকরা উটদের নিয়ে যেতে এল। শত চেষ্টা করেও উটদের দাঁড় করাতেই পারল না। ভয় পেয়ে মইনুদ্দিনের পায়ে পড়ে। মুরশিদ বললেন, 'এবার উটদের ওঠার সময়।' উঠে দাঁড়াল উটেরা সব। রক্ষীরা বলল,

‘প্রভু আপনারা যেখানে ইচ্ছা থাকুন।’ থাকার জায়গা হলো।

এবার খাওয়া। সুফিরা গয়লাদের কাছে গিয়ে এঁড়ে বাছুর চায়। তারা হেসে আকুল। কোন কম্মে লাগবে! বড়ো করে বলদ গাড়িতে জুতবে নাকি! সস্তায় দিয়ে দেয়। যখন দেখে সেই বাছুর কেটে তার মাংস ধুতে সুফিরা সায়রের ঘাটে এনেছে তখন হুলুস্থূল। পুরোহিত আমআদমি সব রে-রে করে ছুটে এসে সুফিদের তাড়ায়। ধোওয়াধুয়ির তো প্রশ্নই ওঠে না, পানীয় জল পর্যন্ত তারা এই সায়র থেকে নিতে দেবে না। এর তীরে কত মন্দির রয়েছে। সেখানে প্রতিদিন দেবোপাসনা চলে মহাসমারোহে। মইনুদ্দিন তাদের চোখে চোখে রেখে সুফিদের চুপচাপ নিজেদের ডেরায় ফিরে আসতে বলেন। পরদিন সকালে ফজরের নমাজ শেষ হতে না হতে মানুষজনের আর্তনাদ। সর্বনাশ, সায়র থেকে এক রাতের মধ্যে সব জল উধাও। খটখটে শুকনো। স্বয়ং ব্রাহ্মণ পুরোহিত হাত জোড় করে মইনুদ্দিনের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

‘অপরাধ মার্জনা করুন। আপনার মাহাত্ম্য আমরা বুঝতে পারিনি।’

‘মাহাত্ম্য আমার নয়, আমি যাঁর উপাসক তাঁর।’

‘কে তিনি?’

‘বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র প্রভু, আল্লা। পানি তিনি নিয়েছেন, তিনিই ফিরিয়ে দিতে পারেন। আপনারা তাঁকে মানবেন?’

পুরোহিত সহ বহু কণ্ঠ একসঙ্গে বলে উঠল, ‘মানব।’

‘আসুন, আমার দিকে তাকান, সকলের চোখ মুরশিদের দিকে। খানিকক্ষণ কাটে। এবার চলুন, তালাওয়ে ফিরে যাওয়া যাক।’ সকলে যায়। সায়রে টলটল করছে জল। কানায় কানায় ভরা।

‘বলুন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো মহাম্মাদুর রসুলাল্লাহ...’

এইভাবে কত কাফের অন্ধকার থেকে মুক্তি পেল। একের পর এক কেরামত। একবার ভয়ে বয়ে সইফু জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘হুজুর, আল্লার নিয়মে প্রকৃতি পশুপাখি সবাই বরাবর একভাবে চলে। কী করে অন্যরকম হচ্ছে?’

স্মিত মুখে মুরশিদ বলেন, ‘আল্লার নিয়মেই সব চলছে। অন্য রকমটা মানুষের মোহ। তাই নজর ভুল হয়।’

সন্তদের আল্লা নাকি বিশেষ ক্ষমতা দেন। মইনুদ্দিন তাহলে তেমনই সন্ত। নিজের চোখে দেখে দেখে সইফুর গা শিউরে ওঠে। মাথা কেমন করে। সে তাড়াতাড়ি সুলতানের কাজে মন দেয়। হ্যাঁ, অনেক খবরই সে পাঠিয়েছে। ভাগ্যে হরেক বুলি শেখার তার স্বাভাবিক এলেম ছিল। আর বাজারহাট করা লোকের সঙ্গে যোগাযোগের ভারটা তার ওপরেই ন্যস্ত। হিন্দি সে জলদি শিখে নিয়েছে, শহরে ঘোরাফেরা করতে করতে লোকজনের সঙ্গে বাতচিত চালায়। কাফেরদের মধ্যে তার কটা বন্ধুও হয়ে গেছে। সইফুর ওপর তো হুকুমই ছিল, খবরদার ঘুরে সুলতান মহম্মদ ঘোরির সঙ্গে তাদের যে কেনোরকম সম্পর্ক আছে সেকথা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়। প্রসঙ্গ উঠলে আর পাঁচজনের মতো সইফু ঘোরির মুণ্ডুপাত করে কাফেরদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে।

ফলে খুব সহজেই জেনে গেল রাজা পৃথ্বিরাজ তরাইনের পহেলা লড়াইয়ে ঘোরিকে জখম করে পিছু ধাওয়া করেননি। কারণ হিন্দুদের ওটাই রীতি, দুশমন হার স্বীকার করে পিছন ফিরলেই লড়াই খতম। হাজার সাল আগের মহাভারত নামে কিতাবে কাফেরদের লড়াইয়ের সব নিয়ম লিখা আছে। যে হেরেছে, জখম হয়েছে, তার পিছু ধাওয়া করে কতল করা উচিত নয়। ওই মহাভারতেই লিখা লড়াই খালি দিনের বেলা করতে হবে, সূরজ ডুবলে আর লড়াই নয়, যতক্ষণ না সূরজ পরদিন উঠছে। তরাইনের পরের যুদ্ধে রাতের লড়াইয়ে বুদ্ধু কাফেরের হারের খবর অজয়মেরুতে পৌঁছালে সইফু অবাক হয়নি। অবাক হয়নি যে হেরে যাওয়া পৃথ্বিরাজকে পিছু ধাওয়া করে সুলতান কতল করেছেন। তবে তার অবাক লাগে এরকম একটা নিকম্মা রাজা, যে পহেলাবার দুশমনকে তাড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে নয়া বিবি নিয়ে ফুর্তিতে মশগুল থাকে, জখমি দুশমন যে জখমি সাপ, ফির মাথা উঁচাবে, জহর ঢালবে তার জন্য সৈন্যসামন্ত তৈয়ারের কোনো চেষ্টাই করে না, দরবারে বসে বেকার সব লিখালিখি করা আদমিদের বকোয়াস শোনে। সেই রাজাকে কিনা প্রজারা এত পেয়ার করে। দিল্‌পসন্দ পিথৌরার জন্য সকলের এত দুখ। কাফেরদের সইফু কখনো বুঝতে পারবে না। সত্যি কথা বলতে কী এদের ওপর তার কেমন ঘৃণাই হয়, যদিও সুফিদের সবাইকে পেয়ার করাই ফরজ।

তারপর সুলতানের ফৌজ অজয়মেরু পৌঁছে শহর জুড়ে লুঠতরাজ চালায়, রাজার দুর্গ দখল নিয়ে তার বিবি ও আওরতদের সঙ্গে লড়াইয়ের ইসলামি বিধি অনুযায়ী গনিমতের মাল হিসাবে নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা সেরে ভোগ করে, একের পর এক কাফেরদের মন্দির ভেঙে গুঁড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেয়। কাফেরদের মাদ্রাসা যাকে টোল চতুষ্পাঠী বলে, সেগুলো ভাঙে, পুঁথিপত্তর বের করে পোড়ায়। খান্‌কার অন্য সুফিদের সঙ্গে সেও চুপচাপ। চোখ-কান বন্ধ করে বসে থাকে। একটাও মন্দির ভাঙার সময় তারা টুঁ শব্দটি করেনি, একজন আওরতের ইজ্জত বাঁচাতে তারা কেউ কড়ে আঙুলটি নাড়ায়নি। সইফুর শুধু শুয়ে নিদ আসে না। মালুম হয় এভাবেই ইরানজমিনে আরব আক্রমণ, এরকম লাগাতার নিষ্ঠুরতাই জরাথুস্ত্রীদের উৎখাত করেছে।

সইফু কত অজ্ঞ ছিল। যে

অমানুষিকতাকে সে এতকাল তাতার মোঙ্গল সব অসভ্য জাতের স্বভাব ভেবেছে, মুসলমানও সেই একই বর্বরতার শরিক। একদিকে খুন লুঠতরাজ, মন্দির দেবমূর্তি ধ্বংস, নারী ধর্ষণ, আর তার পাশাপাশি ইসলাম মানে শান্তি, আল্লার প্রতি প্রেম, আমআদমিকে পেয়ারের মিঠা মিঠা বুলি। ভুখ লাগে না, দানাপানি দেখলে যেন উলটি আসে। কাফেরদের ওপর ইসলামের রাজ কায়েম করায় মদতের ইনাম। মাঝে মাঝে সইফু কাউকে না জানিয়ে হিন্দু ধ্বংসস্তূপ ঘুরে ঘুরে দেখে। কত শত বছরের সব অনুপম কীর্তির আজ এই পরিণতির জন্য সে নিজেও কী দায়ী নয়? পৃথ্বিরাজের পূর্বপুরুষ বিগ্রহরাজ বহু রাজ্য জয় করে এই বিরাট সাম্রাজ্যের অধিপতি আদর্শ হিন্দু শাসক ছিলেন। পাথরে উৎকীর্ণ তাঁর বর্ণনা সইফুর চোখের সামনে, 'দীনদুর্গত রক্ষক'। ভারী মনে খান্‌কায় ফেরে। পরবর্তীকালে আর এসবও দেখতে পায় না। হিন্দুদের মহলমন্দির চতুষ্পাঠী ভাঙা সুন্দর সুন্দর টুকরো মুসলমানদের মসজিদ আর ইমারতে লাগানো হতে থাকে।

মইনুদ্দিন সাহেব সবাইকে বলেছেন, গরিব দুঃখীদের কাছে টানতে। তারা কারা? হিন্দু সমাজের জাতিভেদের শিকার অচ্ছুত নিম্নবর্গের মানুষজন। প্রচার চলে ইসলামে জাতপাত নেই, ব্রাহ্মণের দাপট নেই, পূজাতে নৈবেদ্য ফুলবেলপাতা ভোগের বালাই নেই। খুব সস্তার ধরম, সব ঝড়তিপড়তিরা দলে দলে এসে কলমা পড়ছে। তবে আরবিতে পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ আদায় করতে পারছে কী না সন্দেহ। মইনুদ্দিন বলেন, 'কী পারল কতখানি পারল বিচারের প্রয়োজন নেই। মুসলমান হলেই যথেষ্ট, বাকি আস্তে আস্তে হবে।'

তিনি আবার হিন্দুদের মতো গানবাজনা চালু করেছেন। অনেক সুফির কিন্তু ছিল। কোরানে কি এসব হালাল? মুরশিদ বললেন, 'মূর্তিপূজারিদের রেওয়াজ নাচগান বাজনা নৌটঙ্কি, মরশুমে মরশুমে উৎসব, আলোর রোশনাই। দেখছ না রামনবমী, নবরাত্রী, দশেরা, দেওয়ালি, হোলি— কিছু না কিছু লেগেই আছে। সালভর পূজাপার্বণ। আমরা একটু কিছু না করলে এদের মন টানব কী করে? শুধু বাত কেরামত যথেষ্ট নয়।' শুরু হলো কাওয়ালির ধুম। দিনে দিনে তাঁর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কত গভীর বাত্ তিনি সহজ করে মিঠা মিঠা করে বলেন। সেসব লেখাও হয়ে যায়। হুজুর কী না পারেন। সইফু মনশ্চক্ষুতে দেখে গৌরবময় ভবিষ্যৎ, অজয়দেবের অজয়মেরু তো পরাজিত, একদিন এর নাম হয়ে আজমীঢ় শরিফ, এই খান্‌কা হবে দরগা, দূরদূরান্ত থেকে অসংখ্য মোমিন আসবে চাদর চড়াতে। আর তাদের মুরশিদ অমর হয়ে থাকবেন। হজরত খাজা মইনুদ্দিন হাসান চিসতি। ভূমিপুত্র সাম্রাজ্যনির্মাতা বিগ্রহরাজের উপাধি দীনদুর্গতরক্ষক, ন্যস্ত হবে তাঁর ওপর। হবেন 'গরিব নাওয়াজ' গরিব রক্ষাকর্তা, সুলতানুল্ হিন্দ। ততদিনে দারুল হারাব থেকে দারুল ইসলামে পরিণত হবে হিন্দ, যেমন সারা ইরানজমিন হয়েছে।

তাজ্জব ব্যাপার হলো, এসবে সইফুর দিল্ তেমন খুশ হয় না। কোথায় যেন একটা কাঁটা বেঁধে। এদিকে তার গোপন কর্ম ধীরে ধীরে কমছে। সুলতান পৃথ্বিরাজের লেড়কাকে সিংহাসনে বসিয়ে গেছেন, সে সুলতানকে মেনে নিয়েছে। আশপাশের সব হিন্দু রাজ্য সুলতান জয় করে নিয়েছেন। তবু চোখ খোলা রাখতে হয়। ঘুর-এর ফৌজের তুলনায় দিশি মুসলমানদের অনুপাতে মুলুকে কাফেরের সংখ্যা বহুগুণ বেশি। কেউ ষড়যন্ত্র করে এককাঠ্ঠা হওয়ার চেষ্টা করছে কিনা খেয়াল কর। এর মধ্যে কোনো এক শয়তান, খাক্কার জাতের কাফের মসজিদে নমাজ পড়ার সময় সুলতানকে খুন করে দিল। তাঁর তো আওলাদ ছিল না। তুর্কি গুলামদের বহুত পেয়ার করতেন তাদেরই একজন সিপাহ্‌সলার দিল্লিতে সুলতান হয়ে শুরু করল গুলামশাহি।

দিন যায়। সইফুর আর মন লাগে না। তার তবিয়ত দিন দিন খারাপ হয়। যেসব কাফের প্রথমে কলমা পড়েছিল তাদের মধ্যে এক পুরোহিতের সঙ্গে তার দোস্তি। তার নাম এখন রহমতুল্লা। খান্‌কায় মুন্সির কাজ করে, দরকার মতো সংস্কৃত থেকে হিন্দভিতে তরজমা করে কাছাকাছি থাকে একা সালভর। তারও দিনে দিনে বয়স হয়েছে। একদিন সইফু জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি গাঁয়ে যাও না? ঘরে সব ভালো তো?'

'ঘর আর কোথায়। মুসলমান হবার সঙ্গে সঙ্গে সাত পুরুষের ভিটেমাটি থেকে সবাইকে কবে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'তোমার মা আছেন তো? তিনি কিছু বলেনি তোমার হয়ে?'

'আমি ধরম ত্যাগ করায় মা কেঁদে কেঁদে পাগল হয়ে গেছে। দিনরাত ঠাকুর ঘরে পড়ে থাকে। মাটিতে মাথা ঠোকে, খালি বিড়বিড় করে বলে, আমার লেড়কা বাপঠাকুরদাকে পানি দেবে না, আমি মরলে মুখে আগুন দেবে না, নরকে যাব নরকে যাব। দুর্গা মায়ি, তুমি কোথায় তুমি কোথায়?'

'সবই আল্লার মরজি। আল্লাকে ডাকো। শান্তি পাবে।' সইফু সুফিকর্তব্য ভোলে না। কিন্তু তার নিজের মনে শান্তি কই। সেখানে উথালপাথাল। শুনতে ভয় করে। স্বপ্নে দেখে কোনো আওরত কাঁদছে। 'দুর্গা মায়ি, তুমি কোথায়?'

শেষে মুরশিদের পায়ে পড়ে। হুজুর মাপ করবেন। আর এখানে থাকতে দিল্ লাগছে না। সে মুলুকে ফিরতে চায়।

মইনুদ্দিন বলেন, 'সারা দুনিয়া আল্লার। সুফি যেখানে থাকে সেটাই তার আপনা মুলুক। তাছাড়া সিস্তানে খান্‌কা নেই, কী করবে ওখানে?'

‘ওখানেও গরিবদুঃখী আছে, তাদের খিদমদ করব।’

‘তোমার বাড়ি ঘরজমি আর নেই। খাবে কী?’

‘পড়াব। মক্তব ছিল, এতদিনে মাদ্রাসাও হয়েছে নিশ্চয়।’

‘বেশ যাও, খোদা হাফিজ।’

এবারে একা। আরও কঠোর আরও দীর্ঘ যেন পথ। তবু শেষ হয়। সিস্তানে পৌঁছে যেন সব অচেনা লাগে আবার চেনাও। কত লোক বেড়েছে। তার গাঁ-ই তো পুরানো সীমানা ছাড়িয়ে কত বড়ো হয়ে গেছে। তবে কবরখানাটা আছে। সইফু আব্বুআম্মির আগাছায় ঢাকা করবদুটো খুঁজে পায়। কিন্তু তার মনে কোনো অনুভূতি হয় না। তিস সাল হয়ে গেছে। বুড়োদের কাছে পরিচয় দেয়। ও, সেই সইফুদ্দিন, এগারো সালে হাফিজ হয়েছিল! কী করছিলে এত কাল? সুফি? বাহ্! হ্যাঁ, মাদ্রাসা হয়েছে, জরুর পড়াবে। সবাই খুশ। শুধু সইফুর মন ভরে না। হিন্দ-এর রূপরং, হরেক কিসিমের মানুষের ভিড়, কোলাহল, উৎসব, পুজোপার্বণ মেলা কিচ্ছু নেই সিস্তানে। সব শূন্য।

একদিন হাঁটতে হাঁটতে যায় গাঁয়ের পুরনো অঞ্চলের দিকে। ভাঙাচোরা পাথরের ঢিবির মধ্যে একটা ফোকর যেন চেনা চেনা লাগে। ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে এক হাড়জিরজিরে জীব, ছেঁড়াখোড়া পোশাক, পিঠটা পুরো নুয়ে গেছে, তোবড়ানো গাল, গর্তেঢোকা চোখ দুটোয় ছানি, যেন দুটো মোতি। বিড়বিড় বকছে। সইফু বিস্ময় সামলে বলে ‘ইনশাল্লা, সোহরাব নানা, তুমি জিন্দা আছো! আমি সইফু।’

‘কে সইফু, সেই সৈয়দের আওলাদ? এতকাল কোথায় ছিলি?’

‘হিন্দ্এ ছিলাম বিশ সাল।’

‘হিন্দ্এ কী করছিলি, জেহাদ?’

‘না, না। আমি সুফি, চিসতিয়া সুফি। সবাইকে পেয়ার গরিবের সেবা আমার কাজ।’

‘ঝুট, সব ঝুট।’ হঠাৎ ক্ষেপে যায় সোহরাব, চেঁচিয়ে ওঠে, ‘শুনতে পাচ্ছিস কোনো আওরত কাঁদছে? আহুরা ম্যাজ্দ বাঁচাও বাঁচাও...’

কত বছর কেটে যায়। ভাঙাচোরা পাথরের ঢিবির মধ্যে বাস করে এক পাগলা। মাঝে মাঝে রাস্তায় বেরিয়ে লোকজনকে ধরে ধরে বলে, ‘শুনতে পাচ্ছ কোনো আওরত কাঁদছে? দুর্গা মাই, বাঁচাও বাঁচাও...’। সিস্তানে কেউ তার কথার মাথামুণ্ডু পায় না।

M.T. GROUP

Estd. 1954

M.T. MECHANICAL WORKS

M.T. INTERNATIONAL

EN. EN. ENGG. WORKS

D-75, Phase - V, Focal Point,
Ludhiana - 141010 (Punjab) India
Ph: 91-161-2670128, 2672128
Fax : 91-161-2673048, 5014188
E-mail : mtgroup54@sify.com
Visit us at : www.mtexports.com

Manufacturers :
Domestic Sewing Machine & Parts, Overlock Machines, Industrial Machine, TA-1, Embroidery, Bag closer and Aari Machines

Phones : Fac : 2222224, 2222225, 2222226
Resi : 2426562, 5050350

Rai KNITWEARS

842/2, Industrial Area - A,
Backside R.K. Machine Tools Ldt.
LUDHIANA - 141003

HOSIERY MANUFACTURERS
& EXPORTERS OF:

EXCLUSIVE SCHOOL
UNIFORMS & T-SHIRTS
ALL FASHION WEARS

S.T. No. 55615216 Dt. 4-9-68
C. S. T. No. 55615216 Dt. 10-9-68

Ph. :-0161- 2510766, 2512138, 2510572
Fax No. 0161-2510968/ 2609668,
Gram : **TYRES**

HINDUSTAN TYRE CO.

Prop. : HINDUSTAN CYCLES & TUBES (P) LIMITED

Regd. Office :
G-3, TEXTILE COLONY
INDUSTRIAL AREA - A,
LUDHIANA - 141 003

Works :
KANGANWAL
G. T. ROAD
LUDHIANA - 141 120